KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৩৪ নং নিয়োগীপুকুর ষ্ট্রীট লেন, তালতলা
Collection : KLMLGK	Publisher সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য
Title মালঞ্চ	Size 5.5" x 8.5" 13.97 x 21.59 c.m.
Vol & Number ১/১ ১/৩ ২/১-২	Year of Publication পৌষ, ১২৯৫ ফাল্গুন, ১২৯৫ পৌষ-মাঘ, ১২৯৬
	Condition : [✓ Brittle] Good
Editor : ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড।   পৌষ—১২৯৫।

মালঞ্চ।

মাসিক পত্র।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

সূচী।

অঙ্কুর … … … … … ১
অদৃষ্ট (উপন্যাস)—শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় … … ৬
মৈথিলী সুন্দরী … … … … ২১
তিন খানি ছবি (পদ্য)—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন … … ২৭
কংগ্রেস … … … … … ৩২
মালিনী … … … … … ৪৯
তৃণ-গুচ্ছ … … … … … ৫৩

কলিকাতা
৩৪নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেন, তালতলা,
সাবেই বল নবজীবন যন্ত্রে
আপন সৌরি ভট্টাচার্য্য দ্বারা
কবি কহেন, সেফালিকা বিধবা প্রকাশিত।
সাবিত্রী। বঙ্গসুন্দরীর নিকট সাবিত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মালঞ্চ।

প্রথম বর্ষ।

১ম বর্ষ। } পৌষ, ১২৯৫ সাল। { ১ম সংখ্যা।

অঙ্কুর।

বঙ্গ-সাহিত্যে শস্যক্ষেত্র বিস্তর আছে। সেগুলি সারবান্ শস্যেরই ক্ষেত্র;—সুকুমার শস্যেরও ক্ষেত্র। বিবিধ শস্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। তবে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে, আমাদের অদৃষ্ট-বশে বা মাটির দোষে,—যে কারণেই হউক,—কোন্ কারণে ঠিক জানি না,—কতক দিন হইতে সাহিত্যের সুন্দর ক্ষেত্রে শস্যের শ্যামল শোভা আর তেমন দেখিতেছি না; কিন্তু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি চিরস্থায়ী নয়। স্বভাবের নিয়মে শুষ্কতার পর সুবৃষ্টি হয়। সেই নিয়মে অদৃষ্টও ফিরে। সাময়িক অবসাদে অধিক উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। আশা অবশ্যই আছে।

সারবান্ শস্যে সৃষ্টি রক্ষা করে; সুকুমার শস্যও সংসারে প্রয়োজনীয়। কাযেই শস্য-ক্ষেত্রে পৃথিবীর আধখানারও অধিক জোড়া; কিন্তু শস্যের
য়, শাকটী-সব্জিটী-ফুলটী-পাতাটীও জীবন ধারণে প্রয়োজন। তা
ারেই বলুন, আর সাহিত্যেই বলুন। শুভ-যোগে "শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা"
ল অন্ন উঠে না; ফুল-মুকুল-লতা-পাতা নহিলে
য় না। শস্যের সঙ্গে সঙ্গে শাক্-সব্জি চাই,
চাই। সৃষ্টিরক্ষায় শস্য যদি হন রাজা,

শাক্-সব্জি প্রভৃতি তাঁর প্রিয় ও প্রভুবৎসল প্রজা। প্রজা নহিলে রাজার রাজত্ব সম্ভবে না। এ বিষয়ে আর অধিক ইঙ্গিত অনাবশ্যক।

আমাদের সাহিত্যে ফলের ক্ষেত ত আছেই। ফলের ক্ষেতের 'আসে-পাশে' এক আধটা ফুলের গাছও আছে, তাহা দেখিতেছি; কিন্তু ফুলের জন্য একটা স্বতন্ত্র উদ্যান আমরা আজিও স্থাপন করি নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে শস্যের চাষই এতদিন চলিয়াছে, শাক-সবজির উপর আমরা বড় একটা দৃষ্টি করি নাই। ফলের গাছে 'সার' দিতে আমরা যত চেষ্টা এতদিন করিয়াছি, ফুলের চারায় তত জল দিই নাই। আমাদের ফলের গাছ ফলবান্ হউক, শস্যক্ষেত্র সুবিস্তৃত ও সুকর্ষিত হউক; কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহাও চাই,—জানিয়াছি অনেকেই চাহেন যে,—শাক-সবজির 'সুপাট' হয়, ফুলটী পাতাটী যত্ন পাইয়া যথাকালে ফুটে। আমরা তাই আজ বড় আদরে, যত্নে ও সন্তর্পণে—কিন্তু বিলক্ষণ ভয়ে ভয়ে,—বঙ্গ সাহিত্যের পৈতৃক স্বোপার্জ্জিত ভদ্রাসন হইতে অর্দ্ধকাঠামাত্র 'পড়তা' ভূমি চিহ্নিত করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র ফুল-বাড়ী—মহাশয়দিগেরই এই 'মালঞ্চ'—প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

'মালঞ্চ' মহাশয়দিগেরই জন্য, আর মহাশয়দিগের যাঁহারা আদর-আহ্লাদের অধিকারিণী, হৃদয়-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী—তাঁহাদেরই জন্য। তাই বিনয়ে ডাকিতেছি,—আপনারা আজ একটীমাত্র 'মালঞ্চে' প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অগ্রেই বলিয়া দিন্—আপনারা কি চাহেন এবং আপনাদের তাঁহারাই বা কি চাহেন। মালঞ্চের কোন্ স্থানে কিসের চারা দিব, কোন্ 'কেয়ারিতে' কি রোপিলে ভাল দেখাইবে,—মহাশয়দের মনঃপূত হইবে,—আমাদিগকে উপদেশ দিয়া উপকৃত করুন। মনের কথা খুলে বলুন,—মনোরঞ্জনের চেষ্টা করি। মালীর নিকট মনের কথা বলিলেই 'মালঞ্চ' সুন্দর হইবে।

অধিক নয়, আধ কাঠা মাত্র আমরা আবাদ করিব। তা'রি মধ্যে যথ সম্ভব, যেথানে যেটী সাজে—ফুলের চারা বসাইব, লতার গাছ পুতিব, শ সব্জি ছড়াইব। ফুল মুকুল, পাতা লতা, শাক্-সব্জি সকল রঙেরই দুই চারিটা করিয়া চারা বে ফুটিবে—কোন্‌টী ফুটিবে না, কোন্ গাছটী কোন্ চারাটী বাঁচিবে—কোন্‌টী বাঁচিবে

বলিতে পারি? ক্ষেতের বীজ, বৃক্ষের কলম,—না জন্মিলে বিশ্বাস কি? তবে বীজ যাতে 'উঠে', ফুল যাতে ফুটে—তার 'পা'ট' আমরা প্রাণ দিয়াও করিব, এখন কেবল এই বলিতে পারি। ইহার অপেক্ষা আর অধিক (সত্য বলিলে) কেই বা বলিতে পারেন!

এই হিমানীর দিনে,—সুখদ সম্ভোগপ্রদ এই হিমানীর দিনে, বীট্‌পালম বাঁধা কপি, আপনারা অবশ্যই চান,—কেই বা না চায়? বীট্, বাঁধাকপি, কনকরাঙা ও কড়াইশুঁটির কিছু কিছু 'কেয়ারি' আমরা করিয়াছি; টাট্‌কা তুলিয়া দিব। পালম ত আছেই; কিন্তু পলতাও পাইবেন; পুঁই ও পুনকোও আমরা পুঁতিয়াছি। পৌষের ডালিতে মানের বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভাদ্রের জন্য উত্তম ওল্-বীজের অনুসন্ধানে আছি; কিন্তু বসন্ত ও বর্ষার বন্দোবস্ত পরে বলিব। আপাততঃ শীত-সম্ভারের কথাই শুনুন।

শীতের সাজিতে গন্ধরাজ আমরা কোথায় পাব? গোলাপ অবশ্যই দিব। গোলাপ দিব, আর দিব গাঁদা;—তা এখন যত চান। 'লালে লাল গুলাব'। পৌষের পিষ্টকের সঙ্গে গাঁদাই সাজিবে ভাল। গুলঞ্চ-গন্ধরাজের সময় এখন নয়,—তা দিব বসন্তে। বেল-বকুল-মাধবী-মল্লিকা, যাঁতি-জুঁই, রমণীয় রজনীগন্ধা, পুষ্প রাজ্যের সব সেরা ফুল সাজাইব—বসন্তের বৈকালিক ডালিতে। তাতে চাপাও দিব। চাঁপা দিব—লক্ষ্মীর ব্রতের জন্য। সরস্বতীর কৃষ্ণ-কুন্তল-গুচ্ছে পরাইতে যে ফুল যাঁর আবশ্যক, সে কেবল আদেশমত পাঠাইব। যদি পারি, আর পাই,—সেফালিকা, সকল সময়েই সরবরাহ করিব।

আঁধারে আঁধারে ফুটে,
আঁধারে ভূতলে লুটে,
কাঁদি সারানিশি, পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া;
মাটিতে রাখিয়া বুক,
জুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া।

কবি কহেন, সেফালিকা বিধবা। আমরা বলি, পুষ্প-সাম্রাজ্যে সেফালিকা সাবিত্রী। বঙ্গসুন্দরীর নিকট সাবিত্রীর সম্ভ্রম সর্ব্বোপরি।

মহাশয়ের পূজার জন্য পদ্ম তুলিতেও পারি; কিন্তু বড় শীত। আর পদ্ম, পূজার জন্য—ইহাও জানিবেন। পদ্মের পবিত্রতা পরমারাধ্যার পূজা ভিন্ন আর কিছুতেই ন্যস্ত হইতে পারে না। ইহা বুঝিয়া যদি মহাশয় ‘ফর্‌মাস’ করেন, এই দারুণ শীতে গভীর জলে নামিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না।

একটা কথা অগ্রেই বলিয়াছি, এখনও আবার বলিতেছি,—শস্য ও ফলের কারবার আমাদের নয়। উক্ত দ্রব্যের জন্য বড় ও বনিয়াদি মহাজনদের মাল-গুদামে মহাশয়কে যাইতে হইবে। ‘মালঞ্চ’ হইতে কেবল ফুলটী পাতাটী আমরা যোগাইব। ‘ফলের প্রত্যাশী’ মহাশয়েরা যদি একান্তই হন,—আমরা ক্ষুদ্র ব্যাপারী, অধিক আর কিছু দিতে পারিব না,—সময়ে অসময়ে এক আধ ছড়া রাজনৈতিক রম্ভা দিব। উক্ত অনুপম ফলের বৃক্ষ বাছিয়া বাছিয়া একটী ঝাড় মালঞ্চের এক কোণে আমরা রোপিয়াছি।

তবে বুঝা গেল—‘মালঞ্চের’ উদ্দেশ্য কি কি। বঙ্গবাসীর দেবমন্দিরে ও বিশ্রামকক্ষে পুষ্পসম্ভার প্রেরণ করা—মালঞ্চের এক উদ্দেশ্য; আর এক উদ্দেশ্য,—সাহিত্যক্ষেত্রের সামান্য; কিন্তু অত্যাবশ্যক উদ্ভিদ নিয়মিত যোগাইয়া, তাঁহাদের ভোজনগৃহ ও ‘ডিনার টেব্‌ল্’ প্রফুল্ল করা। যে দিন জানিব, ‘মালঞ্চের’ দ্রব্যজাত হিন্দু-গৃহের ‘রান্নাঘরে’ আদর পাইয়াছে, সেই দিন বুঝিব—‘মালঞ্চ’ টিঁকিল। তখন আর ‘মালঞ্চ’ বাজে লোকের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইবে না।

এ ‘মালঞ্চের’ মালী যাঁরা সখ করিয়া—আদর ও অনুগ্রহ করিয়া হইয়াছেন এবং হইবেন আশা দিয়াছেন, তাঁরা সকলেই সাহিত্যে স্ব স্ব ক্ষেত্রের সু-কৃষক,—সে ক্ষেত্রের অনেক ‘কারকিত’ তাঁরা করিয়াছেন। দেশী বিদেশী ফল-ফুল সম্বন্ধে তাঁরা বহুদর্শী ও বিজ্ঞ। তাঁদের হাতে তাঁদের কারকিতে ‘মালঞ্চ’ মুকুলিত—পুষ্পিত—হইবার ত কথা। তবুও যদি না হয়, সে দোষ মালঞ্চেরও নয়, মালীরও নয়; সে দোষ—মহাশয়দের মাটির। আমরা ‘মালঞ্চের’ অভিভাবক,—অতি দীন ব্যক্তি, দরিদ্রও বটে; নহিলে এ ক্ষুদ্র ‘মালঞ্চের’ সামান্য লতা-পাতা বেচিতাম না—বিলাইতাম। আমরা আর কি করিব? প্রাণপণে মালঞ্চে অষ্টপ্রহর প্রহরা দিব, মালঞ্চে মালী জুটাইব, সর্ব্বোপরি মহাশয়দের মন যোগাইব। সাহিত্য-উদ্যানের সুপথিক—রসিক ও ভাবুক পথিক,—তিনি যিনিই হউন না, ‘মালঞ্চে’ বাসা পাইবেন। আমরা সকলকেই আন্তরিক আদর যত্ন করিব। কেবল ‘মালঞ্চ’ ময়লা করিতে দিব না।

কিন্তু পাঁচ কথার মধ্যে আর এক কথা। ‘মালঞ্চের’ কথা শুনিয়া, শ্রোতার মনে সেকালের সেই ‘মালিনী মাসীর’ কথা উঠিতে পারে। তা উঠিবেই। অতএব অগ্রেই বলিতেছি,—বলিতেই বা হইবে কেন? কেই বা না জানেন? যে,—এটা ইংরাজের উনবিংশ অব্দ। সে অব্দের আবার আখির ভাগ,—একান্ত অন্তিমকাল। এ সময়ে মান্ধাতার আমলের সেই মালিনীর তল্লাসে আমরা ফিরিতে পারিব না। আর তল্লাস করিয়াই বা আমরা তাহাকে পাইব কোথায়? বহুদিন হইল ‘মালিনী’ মরিয়াছে;—ভালই হইয়াছে। কাল দিন ফুরাইলে মরাই ভাল,—মৃত্যুই হয়। হইতে পারে—সেকালের সেই মালিনীর চিতাভস্মের সংযোগে বা সমষ্টিতে এ কালেও কচিৎ কোন কোন স্থলে এক আধটী আধমালিনী প্রকৃতি অল্পাধিক অঙ্কুরিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁদের প্রতি দূর হইতেই আমাদের নমস্কার।

আসল মালিনী এখন নাই। তাহার শ্মশানের ভগ্নাবশেষ কুড়াইয়া নকল মালিনী সাজাইয়া আমরা মালঞ্চে আনিব না। ফল কথা, মালঞ্চে সে কালের সে মালিনীকে কেহ দেখিতে পাইবেন না। তবে এ কালের সুমার্জ্জিতা সুশীলা ফুলবালারা আহ্লাদ করিয়া অনুগ্রহ ও আমোদ করিয়া অবশ্যই এ মালঞ্চে মালা গাঁথিবেন।

সব কথাই হইয়াছে। এখন কেবল তিন কথা বাকি;—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও অদৃষ্ট। এ তিন কথা আমরা এক কথাতেই সারিব। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ভয় আমরা বড় করি না। আমাদের ‘ক্ষেত্র’ অধিক নয়,—অর্দ্ধকাঠা মাত্র। অনাবৃষ্টি হয়, জল সেঁচিব; অতিবৃষ্টিতে আচ্ছাদন দিব। অর্দ্ধকাঠা সিঞ্চন ও আচ্ছাদন কঠিন নয়। অদৃষ্টের ভয় আমরা অবশ্যই করি, যেহেতু আমরা ‘আর্য্যসন্তান’ (!) কিন্তু ‘অনার্য্য’-শিক্ষা এতটা পাইয়াও কি এক বিন্দু পুরুষকার দেখান আমাদের উচিত নয়! ইচ্ছা ত এই। এখন মহাশয়দের অনুগ্রহ, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ, আর সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপা।

* * *

অদৃষ্ট ।

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণীত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

উপক্রমণিকা ।

"এক দিন পাঠশালার ছুটী হইলে পর সকলে চলিয়া গেলে, গোপাল যেমন নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ীর নীচে এক ছড়া সোণার হার পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল। অমনি তাহা কুড়াইয়া লইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল কোন বালক অসাবধানে ইহা ফেলিয়া গিয়া থাকিবেক। আমি এখন কি করি? যদি দ্বারবানের কাছে রাখিয়া যাই, কি জানি, সে ছোট লোক, সোণার লোভে পাছে অপলাপ করে। অতএব মায়ের কাছে লইয়া যাই, তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিব।"

"দেখ গোপাল, ঐ যে বেড়ি পায় গৌরবর্ণ যুবা পুরুষটী মাটী কাটিয়া রাখিতেছে, ও কে, তুমি জানিতে চাও? তবে শুন। ঐ হতভাগা তোমাদের পাঠশালাতেই পড়িত। সকলে উহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসাও করিত; কিন্তু চিরকালই সমপাঠিদিগের ছুরি, কাগজ, কলম, পয়সা চুরি করিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। উহার মা বাপ জানিয়া শুনিয়াও বারণ করিত না। ক্রমে ক্রমে উহার এমন কু-অভ্যাস জন্মিল যে, কাহারও কোন ভাল বস্তু দেখিলেই চুরি করিতে ইচ্ছা হইত। সুযোগ পাইলে চুরিও করিত। এইরূপ অল্প অল্প চুরি করিতে করিতে সে এক দিবস একটী ঘড়ি চুরি করায় ধরা পড়িল এবং সেই অবধি জেল খাটিতেছে।"

আমার বয়স যখন ৫ বৎসর, তখন আমার হাতে খড়ি হয়। তাহার তিন বৎসর পরে আমি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা পড়ি। আমার পড়া-শুনা কিরূপ হইতেছে, না হইতেছে পিতা তাহার কোন অনুসন্ধান করিতেন না। হঠাৎ এক দিবস তিনি চাদরখানি স্কন্ধে ফেলিয়া

যজমান-বাড়ী যাইতেছেন, এমন সময়ে আমি বারাণ্ডায় বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া উল্লিখিত ছুটী গল্পের প্রথমটী পাঠ করিতেছিলাম। আমার পড়া শুনিয়া পিতা ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বে ছাপার পুঁথিতে তাঁহার ভক্তি ছিল না। সকলেই ছেলেপিলেকে স্কুলে পাঠাইয়া দেয়, এজন্য সেই দেখাদেখি পিতা আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার উপরে তাঁহার যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ ছিল। বলিতেন, "শাস্ত্র (অর্থাৎ সংস্কৃত) পড়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার নিম্নে পারসী। পারসীতে কত কেচ্ছা আছে; কিন্তু ইংরাজিতে কেবল শ্যাল, কুকুর, ব্যাঙের কথা। তবে ছেলেকে স্কুলে দিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, আজ কাল ইংরাজি অর্থকর বিদ্যা। শাস্ত্র শিক্ষার কাল গিয়াছে। এক্ষণে সকলে ক্রিয়া-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়াছে। তবে কষ্টেশ্রেষ্ঠে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও আদ্যশ্রাদ্ধ এই তিনটী কায করে। ইহাতে কাহারও জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না।"

পিতা আমার পড়া শুনিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন, পরে আমার নিকটে আসিয়া আমার পুস্তকখানি লইয়া নিজে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন, আমার পুস্তকে শ্যাল, কুকুর কিম্বা ভেকের গল্প নাই, দেখিয়া যৎপরোনাস্তি খুসি হইয়া আমাকে ছুটী স্থান বাহির করিয়া দিলেন ও কহিলেন, যদু! "তুমি আর কিছু পড় আর না পড়, এই ছুইটী প্রত্যহই এক একবার পড়িবে।" যে ছুইটী গল্প দেখাইয়া দিলেন, তাহাদের কিয়দংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। বলিয়া দিলেন, "এ ছুটী গল্প মুখস্থ করিলেই হইবে না। ঠিক তোমাকে এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে, নচেৎ তোমাতে আর পশুতে তফাত কি? দেখ দেখি, গোপাল কেমন ছেলে! সে অল্প বয়সেই পরের দ্রব্য লওয়া দোষ, তাহা জানিতে পারিয়াছে। আর পরের দ্রব্য লইলে কি ফল হয়, দ্বিতীয় গল্পে বিলক্ষণ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মিথ্যা কথা ও অসৎকাযে কখনও থাকিবে না। মিথ্যা কথায় ও অসৎকার্য্যে কখন কাহারও ভাল হয় না।"

পিতা আমাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনই কিছু বলেন নাই, সুতরাং অদ্য যাহা বলিলেন শুনিয়া আমার যৎপরোনাস্তি উৎসাহ হইল এবং তাঁহার উপদেশানুসারে ঐ গল্প ছুটী প্রত্যহ পড়িতে লাগিলাম। যত পড়ি, ততই আমার সত্যের প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল ও অসৎকর্ম্মের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে আরম্ভ হইল; কিন্তু স্বভাব কখনও হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয় না।

মিথ্যা কথা কহিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তথাপি মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়িত। কিসে না মিথ্যা কহিতে হয়, ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম, 'যে যতই অধিক কথা কয়, সে ততই অধিক মিথ্যা কহে। অনেক সময় এমন হয় যে, কথা কহিবার দরকার নাই, তখন চুপ করিয়া থাকিলেই ভাল হয়; কিন্তু চুপ করিয়া না থাকিয়া কথা কহিতে গেলেই মিথ্যা বাহির হইয়া পড়ে।' এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, অনাবশ্যক কথা আর কহিব না। নিজের বলা উচিত নয়, (কিন্তু যেখানে আমার নাম কেহ জানিতে পারিতেছে না, সেখানে বলিলেও ক্ষতি নাই) অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার মুখ দিয়া আর মিথ্যা কথা বাহির হইত না এবং কোন অহিত কার্য্যও করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসার।

আমার পিতা পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। পুরোহিতের কার্য্যে বিশেষ লাভ নাই। ফল, যদি আমাদিগের কিছু জমাজমী না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের ভরণপোষণ চলা দুষ্কর হইত। কিঞ্চিৎ বিষয় ছিল বলিয়াই, পিতা আমাকে স্কুলে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে আমার ভগ্নীটী বিবাহযোগ্যা হইল। তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে হইবে। পিতার ইচ্ছা একটী কুলীনকে কন্যাটী দান করেন; কিন্তু তাহাতে বিস্তর ব্যয় হইবে বলিয়া প্রতিবাসীরা পরামর্শ দিল, 'তুমি শ্রোত্রীয়, তোমার কুলেয় দোষগুণ দেখিবার দরকার কি? পাত্রটী ভাল হয়,—কুল যত থাকুক, না থাকুক, এমন একটী ব্রাহ্মণের ছেলেকে কন্যাটী দান করুন।' পিতা তাহা শুনিলেন না। যে জমা-জমী ছিল, তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া কন্যাটীকে একটী নিকোষ কুলীনের পুত্রকে দান করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যিনি আমার ভগ্নীপতি হইলেন, তাঁহার আর একটী বিবাহ ছিল। পিতা তাহা জানিতেন। আর একটী বিবাহ ছিল বলিয়া যে অর্থ লাগিয়াছিল, না থাকিলে তাহার অধিক লাগিত, এজন্য

তিনি আর অন্যস্থানে অনুসন্ধান না করিয়াই তাঁহাকেই কন্যা দান করিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, আমার ভগ্নী সপত্নীর কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া আর স্বামিগৃহে বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ও তাঁহার দুইটী পুত্র আসিয়া পিতার আশ্রয় অবলম্বন করিলেন। এই সময় বেহার-প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া উঠিল। ধান চাউল ইত্যাদি মহার্ঘ হইল। পূর্ব্বে যে আয়ে কষ্টেশ্রেষ্ঠে চলিত, এক্ষণে আর তাহাতে চলিল না; সুতরাং পিতাকে অনেক কর্জ্জ করিতে হইল। পিতা জীবিত থাকিলে সে কর্জ্জও শোধ হইতে পারিত, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ক্ষান্ত না হইতে হইতেই তাঁহার মৃত্যু হইল!

আমি অকূল পাথারে পড়িলাম। পরিবার অল্প নয়! আমি, আমার মাতা, আমার ভগ্নী ও দুইটী ভাগিনেয়। কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না! আবার সম্মুখে চতুর্থী, পরে শ্রাদ্ধ। আপাততঃ এক্ষণেই সৎকারের ব্যয়। আমার আর একটী সহোদর ছিলেন, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ। কিন্তু তিনি ক্ষমতাপন্ন হইয়াও আমাদিগকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বাটী আসাই বন্ধ করিয়াছিলেন। পিতার ঘুন্সী হইতে চাবিটী লইয়া সিন্দুক খুলিলাম। দেখিলাম—সিন্দুকে তিনটী টাকা, একটী আধুলি ও সাড়েসাত-আনার পয়সা, আর একটী মোহরের তিন অংশ। অর্থাৎ মাতার একবার পীড়া হইয়াছিল। কবিরাজেরা একটী স্বর্ণঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করেন। পিতা একটী মোহর খরিদ করিয়া তাহার চতুর্থাংশের এক অংশ ঔষধ প্রস্তুতার্থ দিয়াছিলেন, অপর তিন অংশ রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া দুঃখেও একটু সুখ হইল। ভাবিলাম, যে টাকা ও পয়সা আছে, তাহাতেই দাহকার্য্য হইবে; আর মোহরটীর তিন অংশ বিক্রয় করিলে ভগ্নী চতুর্থী করিতে পারিবেন ও আমি তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ ও দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে পারিব।

বিপদের সময় পাড়াপ্রতিবাসিবর্গ আইসে, কিন্তু দুঃখের জন্য কি আমোদ করিবার জন্য তাহা বলা কঠিন! আমাদিগের বাটী হইতে গঙ্গা আট ক্রোশ তফাৎ। ত্রিবেণীতে লইয়া যাইতে হইলে তাহাতেও আর অন্ততঃ ৪ টাকা খরচ। প্রতিবাসিগণ কহিলেন "বাপ মা কাহারো দুবার মরে না। অতএব ত্রিবেণীতে লইয়া যাওয়াই উচিত।" এরূপ পরামর্শ যাঁহারা দিলেন, তাঁহাদিগকে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় আমার হাতে কিছু নাই, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যদি দশটী টাকা কর্জ্জ

দেন তবে আমি পিতার দেহ ত্রিবেণীর ঘাটে দাহ করিতে পারি।" কেহই টাকা দিলেন না। সকলেই কোন না কোন ওজর করিলেন। আমাদিগের পাড়ায় তিনকড়ি গাঙ্গুলী নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুলের একজন মাষ্টার ছিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই কহিতেন—'তিনকড়ি খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে।' পিতার মৃত্যুর সময় তিনকড়ি বাতরোগে শয্যাগত বলিলে হয়, কিন্তু তথাপি একগাছি লাঠি ভর করিয়া আমাদিগের বাটীতে আসিলেন। তখন অন্যান্য সকলে চলিয়া গিয়াছে। তিনি কহিলেন "যদু, তোমাকে সকলেই বলিয়াছে, তোমার পিতার দেহ ত্রিবেণীতে পোড়ান উচিত, না? সকলেই বলিয়াছে, বাপ মা কাহারও ছুবার মরে না, না?" আমি বলিলাম, "সত্যই তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন।" তখন তিনি বলিলেন "আমার কথা শুন, মৃতের জন্য জীবিত লোকের কষ্ট দিও না। তোমার হাতে কি আছে?" আমি যাহা ছিল কহিলাম। তখন তিনি বলিলেন "তোমার নিজের মত কি?" আমি বলিলাম, "যে টাকা ও পয়সা আছে, তাহাতে সৎকার হইবে অর্থাৎ যদি আমি আমাদিগের গ্রামে করি। আর যে মোহরের তিন অংশ আছে, তাহাতে চতুর্থী ও তিলকাঞ্চনের শ্রাদ্ধ হইবে।" তিনি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা এখন আর অধিক করিবার দরকার নাই। আমার কথা শুন, মৃতের খাতিরে জীবিতদিগকে মারিয়া ফেলা উচিত নয়। কাহারো কথা শুনিও না। যাহা তুমি নিজে বিবেচনা করিয়াছ, তাহাই করিও।" এই বলিয়া উঠিলেন। উঠিয়া দুই চারি পা গিয়া ফিরিলেন, যেন হঠাৎ কোন কথা মনে পড়িল। তখন পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, "কি জানি যদু, যদি তোমার খরচের অনাটন হয়, তবে এই দশ টাকা তোমার কাছে থাকিল, খরচ করিও; কিন্তু বিশেষ দরকার না হইলে ইহাতে হাত দিও না।" আমি কথা কহিতে না কহিতে তিনি লাঠিতে ভর দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি যে উপকার স্বীকার করিব, আমাকে সে সময়ও দিলেন না। তাঁহার এই দয়াতে আমার চক্ষে যে জল আসিল, পিতার মৃত্যুতেও সেরূপ আইসে নাই। বোধ হয় ইহার কারণ এই, "জন্মে মৃত্যু, বিধাতার এ বিধি জগতে।" পিতা মরিবেনই মরিবেন; সুতরাং যখন মরিলেন তখন ভাবিলাম, আমিও ত তাঁহার কাছে শীঘ্রই যাইব। তবে

আর অধিক দুঃখ কেন? কিন্তু তিনকড়ি বাবুর মত অমন মিষ্টি কথা আমাকে কেহই কহে নাই, অমন দয়া আমাকে কেহই করে নাই। এখানে একটা কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। লোকে আঘাত পাইলে, কটু কথা শুনিলে—রোদন করে। কিন্তু আমার মন কেমন বলিতে পারি না, মিষ্টিকথা শুনিলে আমার চক্ষে জল ধরে না;—মার খাইলে কটুকথা শুনিলে রাগ হয়!

পিতার সৎকার হইল, শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। যে ব্যয়ে সমস্ত নির্ব্বাহ করিব মনে করিয়াছিলাম তাহাতে কুলাইল না। এক্ষণে তাঁহার যে দেনা ছিল তাহার কি করা উচিত ভাবিতে লাগিলাম। ঘরে যে ধান চাউল ছিল ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। পিতা যে সমস্ত কর্জ্জপত্র করিয়াছিলেন, তাহার কোন খতপত্র ছিল না; কিন্তু আমি কাহাকেও বঞ্চনা করিব—এরূপ দুরভিসন্ধি কখনও আমার মনে স্থান পায় নাই। যিনি বাতে পঙ্গু হইয়াও পিতার মৃত্যুর পর আমাদিগের বাটীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আর পরামর্শ লইবার যো নাই। তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন! তিনি আমাকে যে দশ টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক। পিতা যে সমস্ত টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই আমাদের ভগ্নিপত্তির। বিশেষ আমার ভগ্নিপতি যেরূপ পরামর্শ দিবেন অমন আর কে দিবে? এই ভাবিয়া ভগ্নিপতির বাটীতে গেলাম। ভগ্নিপতির আমার বাটীতে আসিবার যো নাই। তাঁহার পূর্ব্বস্ত্রী তাঁহাকে আমাদিগের বাটীতে আসিতে দেন না। আমি গিয়া তাঁহাকে সমস্ত সবিস্তারে বলিলাম, তিনি আহারাদির পর আমাকে জবাব দিবেন বলিলেন। যাহার দেনা আছে সে যেমন ক্লেশে কাল যাপন করে, বোধ হয় তত ক্লেশে আর কেহই কাল যাপন করে না। এক এক মিনিট আমার এক এক বৎসরের মতন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে আহারাদি হইয়া গেল। পরে আমি পুনরায় আমার ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করা উচিত?" তিনি বাটীর ভিতর গিয়া আমার ভগ্নীর সপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার বিবেচনায় তোমার যে জমাজমী আছে, সেগুলি বেচিয়া সমস্ত দেনা পরিশোধ কর।" এ কথায় আমারও মত মিলিল। এরূপ করিলে প্রত্যহ আর তাগাদা সহ্য করিতে হইবে না। বাটী আসিয়া সমস্ত জমাজমী বিক্রয় করিলাম। যে মূল্য পাইলাম তাহাতে সমস্ত দেনা পরি-

শোধ হইয়াও কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইল। তাহা আমার মাতার হস্তে দিয়া বলিলাম, "মা আমি চলিলাম, ঘরে বসিয়া থাকিলে আর কোন মতে চলিবে না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন একটু চাকুরি পাই, এবং সকলকে প্রতিপালন করিতে পারি।" মাতা শুনিয়া যেরূপ কথা কহিলেন, যেরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন ও যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সে সমস্ত শুনিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ !

সুখ দুঃখ কখন চিরস্থায়ী নহে।

আমার যেরূপ বিদ্যা তাহাতে আর কোন্ চাকুরি মিলিবে? সবে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়াছিলাম। এই তো আমার বিদ্যা। আমি যেখানে যাই, সেই খানেই শুনি, কোন কায খালি নাই। প্রথমতঃ চানকে একজন ডাক্তারের বাটীতে দশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলাম। আমার কায এই হইল যে,—বাজার হিসাব রাখিতে হইবে, ডাক্তার বাবু কোন্ দিন কত পাইলেন তাহার একটী হিসাব রাখিতে হইবে ও তাঁহার একটী পুত্র ও তাঁহার ভ্রাতার একটী পুত্রকে পড়াইতে হইবে। দশ টাকা বেতন আমার পক্ষে প্রচুর বোধ হইল, কারণ আমাকে নিজবাটীতে আহার করিতে দিতেন। সে জন্য বেতন হইতে কিছু কাটিতেন না। এ কার্য্যে সমস্তই সুখ ছিল। দোষের মধ্যে এই যে, মাঝে মাঝে রুটী খাইতে হইত। বাবুর স্ত্রী ও তাঁহার ভ্রাতার স্ত্রী উভয়েই পানসাজা ভিন্ন আর কোন কর্ম্ম করিতে জানিতেন না। রন্ধনাদি তাঁহার মাতা ও পিসীমাতা করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের যখন কোনরূপ অসুখ হইত, তখন চাকরেরা রুটী প্রস্তুত করিয়া দিত। বাবুও সেই রুটী খাইতেন, আমিও তাহাই খাইতাম। কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে লোক, রুটী খাইলে আমাদিগের বোধ হয় যেন কিছুই খাওয়া হইল না। তবে আমি আমার নিজের জন্য চাকুরি করিতে যাই নাই, সুতরাং আমি ভাল খাই বা মন্দ খাই, কিম্বা খাই; আর না খাই, সে জন্য কোন কষ্ট বোধ করিতাম না।

ডাক্তারবাবুর বাটী থাকিতে থাকিতে আমি রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে শিখিলাম। কখন্ কোন্ ঔষধ দিতে হয়, তাহাও শিখিলাম। নাড়ী দেখিতে শিখিলাম। ডাক্তার বাবু কোন কোন স্থানে এরূপ ঔষধ দিয়া আসিতেন, তাহা নাড়ী দেখিয়া খাওয়াইতে হইত। যদি নাড়ী কমজোর হয়, তখনি সে ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে; যদি স্বাভাবিক চলে তবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে হইবে। এ সমস্ত স্থলে আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, আমি তাঁহার আদেশমত সেবন করাইতাম। আমি যেখানে যে কয় দিন থাকিতাম, ডাক্তার বাবু নিজের দর্শনীর উপর আমার পরিশ্রমের দরুণ প্রত্যহ দু টাকা করিয়া লইতেন। সে টাকা অবশ্যই আমি পাইতাম না, কিন্তু না পাওয়ার দরুণ আমার যেন দুঃখও হইত না। এদিকে মাস কাবার হইতে হইতেই আমার বেতন ১০ টাকা পাইতাম। টাকাগুলি তখনিই বাটী পাঠাইয়া দিতাম এবং তাহাতেই বাটীর সকলের কথঞ্চিৎ ভরণপোষণ চলিত।

ডাক্তারবাবুর একটী বিধবা কন্যা ছিল। কন্যাটীর বয়স ১৮।১৯ বৎসরের অধিক হইবে না। তাঁহার অন্যান্য সন্তান ছিল, কিন্তু এই কন্যাটীই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সুতরাং ডাক্তারবাবু ইহাঁকে যত ভাল বাসিতেন এত আর কাহাকেও বাসিতেন না। হঠাৎ কন্যাটীর জ্বর হইল। পরে তিন দিনের দিন গায়ে বসন্ত দেখা দিল। কন্যাটীর টীকা হইয়াছিল কিন্তু তথাপি বসন্ত হইল। আমি শুনিয়াছি কলিকাতায় এরূপ একবার হইয়াছিল। কন্যাটীর নাম সুলোচনা। সুলোচনা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। বিধাতা বুঝি রূপে গুণে এরূপ কন্যা আর একটাও সৃজন করেন নাই। বসন্ত হইয়া সুলোচনার এরূপ অবস্থা হইল যে, তাহাকে আর কেহ চিনিতে পারিত না। ডাক্তারবাবু নিজে দিন কয়েক চিকিৎসা করিলেন, পরে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে যে যে ডাক্তার ছিলেন তাহাদিগকে দেখাইলেন, পরিশেষে কলিকাতার কলেজের ডাক্তার আসিতে লাগিল। আমার উপর সেবা শুশ্রূষার ভার ছিল। আমি আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতাম। আমার নিজের ভগ্নী হইলেও আমি আর অধিক যত্ন করিতে পারিতাম না। ডাক্তার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী ত যত্ন করিবেনই। কিন্তু দুই তিন রাত জাগিয়া তাঁহারা আর জাগিতে পারিলেন না। আমার চক্ষে কিন্তু নিদ্রা নাই। আমি

দিনরাত সমভাবে একাগ্রমনে রোগীর সেবা করিতাম। পরমেশ্বর আমার উপর দয়া করিলেন, আমার শ্রমের সাফল্য হইল। কন্যাটী আরোগ্য হইয়া উঠিল। বাপ মায়ের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। আমার যে আনন্দ হইল তাহা আর কহিবার নহে। বিশেষ সমস্ত ডাক্তারই বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমারি শুশ্রূষাগুণেই কন্যাটী আরোগ্য হইয়াছে। আমার কিন্তু এক দুঃখ হইল, ডাক্তারবাবু আমি যে যত্ন করিয়াছিলাম সে বিষয়ে একবারও একটী কথা কহিলেন না। আমি মনে করিলাম, আমি ডাক্তারবাবুর ভৃত্য। আমি যাহা করিয়াছি সে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা না করিলেই মন্দ হইত। করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশেষ প্রশংসার কথা কি? এইরূপে মনকে প্রবোধ দি, কিন্তু মন প্রবোধ মানে না। আমি ইহার কারণ জানি না। বোধ হয় যাঁহারা অনেক পড়া শুনা করিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই হউক, কিম্বা অনাহারে ও রাত্রিজাগরণের কারণেই হউক কয়েক দিবস পরেই আমি উৎকট জ্বররোগে আক্রান্ত হইলাম। ডাক্তারবাবু বলিলেন, আমার টাইফএড ফিবার হইয়াছে। ডাক্তারবাবুর বাটীতে অনেক দিবস থাকায় আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, টাইফএড জ্বর অতি ভয়ানক জ্বর, এবং ইহা হইতে আরোগ্য হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই ভাবিয়া, বাস্তবিক আমি যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও বোধ হইল যেন আমি অধিক দুর্ব্বল হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি ডাক্তার বাবুর ডাক্তারখানার একটা কুঠুরিতে থাকিতাম, কিন্তু সেখানে সর্ব্বদা তাঁহার সন্তানাদি আইসে বলিয়া আমাকে তাঁহার আস্তাবলে, যেখানে তাঁহার সইস শুইয়া থাকিত সেই থানে পাঠাইয়া দিলেন। আমি সেই থানেই থাকি, ডাক্তারবাবু প্রত্যহ আমার জন্য ঔষধ পাঠাইয়া দেন, নিজে প্রায় দেখিতে আসিতেন না। আমাকে ঔষধ সেবন করাইবার ভার ডাক্তারবাবুর সইসের স্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইল। সে আমাকে নিয়মমত ঔষধ দিত না। প্রত্যহ চারিবার ঔষধ দিবার কথা—কোন দিন একবার, কোন দিন দুবার দিত। এই দুইবারেই সমস্ত ঔষধ খরচ করিয়া ফেলিত। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকিত বোতল হইতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিত। কালে ভদ্রে ডাক্তারবাবুর দেখা পাইলে যদি আমি বলিতাম যে নিয়মিত ঔষধ পাই নাই—সইসের স্ত্রী বলিত যে, আমি

সমস্ত দিন বেহুঁস থাকি ও এলোমেলো বকি, কখন্ কি ঔষধ বা পথ্য পাই তাহা আমার মনে থাকে না। ডাক্তারবাবু তাহারি কথা বিশ্বাস করিতেন, আমার কথা প্রলাপমাত্র মনে করিতেন।

ক্রমে ক্রমে আমি সত্যই বেহুঁস হইয়া পড়িলাম। কতদিন এরূপ অবস্থায় ছিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই। এক দিবস স্বপ্নে দেখিলাম, যেন ডাক্তারবাবুর কন্যা আসিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম স্বপ্ন সত্যই, যথার্থই ডাক্তারবাবুর কন্যা আমার শিয়রে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। আমাকে জাগ্রত দেখিয়া সুলোচনা কহিলেন, "দাদা, আর একটু ঘুমুন।" আমি চেষ্টা করিলাম, আর নিদ্রা হইল না। আরোগ্য হইয়া শুনিলাম অনেক দিবস পরে এই নিদ্রাই আমার প্রথম নিদ্রা হইয়াছিল। এই অবধি আমি দিন দিন ভাল হইতে লাগিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি প্রায় পূর্ব্বের মতন হইলাম।

ডাক্তার বাবুর কন্যা আমার পীড়ার কোন্ অবস্থা হইতে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি নিজে পীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ আছে, তিনি আরোগ্য হইয়াছিলেন তাহাও আমার বিলক্ষণ মনে আসিতেছে, কিন্তু আমার নিজের পীড়ার প্রথম কয়েক দিবস ভিন্ন আর কিছুই মনে নাই, কত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কিছুই স্মরণ করিতে পারি না।

যে দিবস সুলোচনাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, সেই দিবস হইতে সুলোচনা প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিতেন। প্রথম প্রথম আসিয়া, কেবল কেমন আছি, এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইতেন। পূর্ব্বে তাঁহার উপর আমার যে ভক্তি ছিল এক্ষণে সে ভক্তি যে কত প্রবল হইল বলিতে পারি না। তিনি অদ্যাপিও পূর্ব্বের মত বলবান্ হন নাই, তথাপি আমি তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলাম বলিয়া তিনি তাঁহার সাধ্যমত প্রতিশোধ দিতে আসিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম প্রথম আসিয়া আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করিয়া সুলোচনা চলিয়া যাইতেন। এই অনুগ্রহে আমি যে কত কৃতজ্ঞ হইতাম বলিতে পারি না। প্রতিদিন তিনি অল্প অল্প করিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখনও সম্পূর্ণরূপ বল পাই নাই, কিন্তু যতক্ষণ তিনি নিকটে থাকিতেন ততক্ষণ আমি যেন স্বর্গসুখ উপভোগ

করিতাম। আমার বোধ হইত, আমার যেন কখন কোন পীড়া হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার শুভাগমন আমার পক্ষে শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় হইয়া উঠিল। প্রত্যহই পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা অধিকক্ষণ থাকিতেন; কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমার পক্ষে পৌর্ণমাসী আসিল না। অতি সত্বরই অমাবস্যা সমাগত হইল।

অমাবস্যা সমাগত হইল বলিলাম কেন? জানিতে চাও?—শুন! এক দিবস অপরাহ্নে, প্রত্যহ যেরূপ আসিতেন, সুলোচনা আমার আলয়ে অর্থাৎ আস্তাবলের যে কুটীরে আমি থাকিতাম সেই কুটীরে আসিলেন না। আমি মনে করিতেছিলাম কখন আসিবেন কখন আসিবেন, কারণ অন্যান্য দিবস যে সময় আসিতেন সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আঁর গাছের ছায়া সে সময় অন্যান্য দিবস অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ভাবিলাম, আজি বুঝি সুলোচনা আসিবেন না। সইস, সইসের স্ত্রী উভয়েই বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সইস বাজার করিতে, সইসের স্ত্রী—কাটকুড়াইতে। আমি একাকী বসিয়া আছি। বোধ হয় সেই জন্যই সুলোচনার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আরও কষ্ট হইতেছিল। ভাবিতেছি, এমন সময় যেন নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল—হঠাৎ সুলোচনা আসিলেন। আমার মন প্রফুল্ল হইল, চতুর্দ্দিক প্রফুল্ল হইল। পৃথিবী আনন্দে ভাসিল। অর্থাৎ আমার পৃথিবী। কারণ, সুলোচনা যখন যেখানে থাকিবেন সেস্থান আনন্দে ভাসিবেই ভাসিবে। সুলোচনা আমার নিকটে আসিলেন। কহিলেন, "কেমন আছ?" আমি বলিলাম, "চন্দ্রের নিকট অন্ধকার থাকিতে পারে না। আমার উপর আপনার কৃপা আছে, আমি ভাল ছাড়া মন্দ থাকিব কেন?" সুলোচনা আমার নিকট আসিয়া পদ্মহস্ত দ্বারা আমার কপাল স্পর্শ করিলেন। অনেক দিবস হইতে এরূপ কখনও করেন নাই। আমার বোধ হইল, যেন আমি আর এ পৃথিবীতে নাই, যেন নভোমণ্ডলে, চিরচন্দ্রালোক-প্রতিভাত প্রদেশে আছি।

হায় সুখ! তুমি কি কখন কাহারও হৃদয়ে অধিকক্ষণ থাকিতে শেখ নাই? সুলোচনা এ-ও-সে নানা কথার পর কহিলেন, "তোমাকে আমি যৎপরোনাস্তি ভালবাসি, তুমি তাহা টের পাও?"

যদু। আপনি বলেন কি? আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছেন জানিতে আর বাকি আছে কি?

সুলোচনা। ওকথা বলিও না, তুমিই আমাকে বাঁচাইয়াছ। আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি অত কৃতজ্ঞ হচ্ছো?

যদু। আপনি আমার কি করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করেন? আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন।

সুলোচনা। বাবা তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন সেজন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। আমার পীড়া ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর ছিল, অনেক সংক্রামক ছিল; কিন্তু পিতা আমাকে ঘরে রাখিয়াছিলেন। তোমার পীড়া তত খারাপ নহে, তথাপি তোমাকে এখানে এই আস্তাবলে পাঠাইলেন কেন, বুঝিতে পারি না।

বলা বাহুল্য, আমার মনেও ঐ কথাটী সর্ব্বদা উদিত হইত। কিন্তু আমি সে কথা আর কাহাকে বলিব? বলিলেই বা কি ফল হইবে? এই জন্য আমি মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলাম। সুলোচনা যখন ও কথার উল্লেখ করিলেন তখন যেন আমার দুঃখ উথলিয়া উঠিল। আমি গাঢ়স্বরে বলিলাম, "বোধ হয়, আমরা যে অবস্থার লোক সেই অবস্থায় না থাকিলে আমার পীড়া আরোগ্য হইবে না, এই জন্যই আমাকে আস্তাবলে পাঠাইয়াছেন।" কথাটী শেষ হইতে না হইতেই আমার চক্ষু দিয়া একটু জল পড়িল। সুলোচনা আমার চক্ষে জল দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন। অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আমাকে ওকথা কেন বল?" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। আমি আর সুলোচোনার দিকে তাকাইতে পারিলাম না। সুলোচনা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন ও তখনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। আমার যে কত আত্মগ্লানি হইল তাহা বলিতে পারি না। কন্যার নিকট পিতার নিন্দা! ইহা অপেক্ষা আর কাপুরুষতা কি হইতে পারে? এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় সুলোচনা পুনরায় আসিলেন। বলিলেন, "বাটীতে কেউ নেই, তোমাকে একলা রেখে যাব না।" এই কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্বের লজ্জা যেন দশগুণ বৃদ্ধি হইল। আমি সে লজ্জা ঢাকিতে গিয়া যাহা যাহা বলিলাম, সকলিই যেন প্রলাপ-বাক্যের মতন হইল। তাহা স্মরণ হইলে এখনও আমার লজ্জা বোধ হয়।

ক্ষণকাল পরে সইসের স্ত্রী ফিরিয়া আসিল। তখন সুলোচনা চলিয়া গেলেন। বাহ্যাকাশে এখনও সূর্য্যের আলোক আছে, কিন্তু আমার

হৃদয়াকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আমি শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে আমার নিদ্রা হইল। ঘণ্টা দুই নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর জাগরিত হইলাম। জাগরিত হইয়া আমার জন্য সইসের স্ত্রী যে পথ্য রাখিয়াছিল, তাহা আহার করিয়া পুনরায় নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এবার আর সহজে নিদ্রা হইল না। এ-ও-সে নানা প্রকার ভাবনা আসিতে লাগিল, কিন্তু সুলোচনার ভাবনাই সর্ব্বপ্রধান। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়িল। যাই পড়িল, অমনি আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল, লোম কণ্টকিত হইল, আমার সুখের শেষ হইল। আমি জন্মের মতন ডাক্তারবাবুর আস্তাবল ও ডাক্তারবাবুর আশ্রয় ত্যাগ করিলাম।

বলিয়াছি, এ-ও-সে নানা কথা ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ মনে হইল, সুলোচনাকে কি আমি আর আপন সহোদরার ন্যায় ভালবাসি? হাঁ, বাসি বই কি? মন যেন মন খুলিয়া এ জবাব দিল না। মনকে ফের জিজ্ঞাসা করিলাম। এবার মন আর কোনরূপ জবাব দিল না। অমনি আমার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম, আমি মানুষ না পশু? যে সুলোচনাকে আমি নিজের সহোদরার ন্যায় ভক্তি করিতাম, তাহার উপর ভিন্ন ভাব! মাঘ মাস, তথাপি ঘর্ম্মে আমার শরীর ভিজিয়া গেল। আমি ভাবিলাম, এস্থানে আর ক্ষণকাল অবস্থিতি করাও আমার উচিত নয়। আমি তখনও অত্যন্ত কাহিল, কিন্তু তথাপি সে রাত্রি আমার সেখানে থাকিতে সাহস হইল না। আমার বস্ত্রাদি সমস্ত ব্যাগে রাখিলাম। বিছানাপত্রাদি আর একটা বোচকায় রাখিলাম। কিন্তু তখন আর একটা প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল—আমার হস্তে খরচপত্র কিছুমাত্র ছিল না। ডাক্তারবাবুর নিকটে আমার এক মাসের বেতন বাকী ছিল, কিন্তু অত রাত্রে তাঁহার নিকট কে যাইবে? যাইয়াই বা বেতন চাহিলে তিনি কি মনে করিবেন? সইসের নিকট ধার চাহিলে সে তো দিবেই না। অথচ আমার সেই রাত্রেই না বাহির হইলে নয়। ডাক্তারখানায় আর যে যে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগের নিকট দু এক টাকা চাহিলে পাইতাম কি না, বলিতে পারি না। না পাওয়াই সম্ভব—যাহা হউক, আমি তাঁহাদিগের নিকট গেলাম না। গেলে নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসিত হইতাম ও সে সমস্ত কথার জবাব দিতে হইত।

শীতকালের প্রারম্ভে আমি একটা গরম কোট প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম। কোটটা যখন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তখন আমি পীড়িত। সুতরাং আমি তাহা ব্যবহার করি নাই। সেকরা ও দরজী কত শীঘ্র দ্রব্যাদি দেয় তাহা সকলেই জানেন। ফল, আমার কোটটা নূতন রহিয়াছিল। মনে করিলাম, এই কোটটা বেচিয়াই রাস্তার খরচ দিব। ‘দুর্গা দুর্গা’ বলিয়া আমি আস্তাবল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। খানিক দূর গিয়া আমি আর চলিতে পারিলাম না। আমার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আস্তাবল হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন অধিক দূর নহে, কিন্তু আমি ততদূরও যাইতে পারিলাম না। রাস্তার ধারে একঝাড় বাঁশ ছিল, আমি সেই বাঁশতলায় শয়ন করিলাম। শয়ন করিবামাত্রেই নিদ্রিত হইলাম। রাত্রিতে অনেকক্ষণ নিদ্রা হয় নাই। কতক সেই কারণে, আর অনেক দিবস কোনরূপ পরিশ্রম করি নাই—এই উভয় কারণে আমার এরূপ গাঢ় নিদ্রা হইল যে, পর দিবস আট্টার সময় আমি জাগ্রত হইলাম। বোধ হয় তখনও আমি জাগ্রত হইতাম না। কিন্তু রাস্তায় যে আইসে সেই বলে, “দেখ, একটা মাতাল পড়িয়া রহিয়াছে।” যে এই কথা শুনে, সেই হাসিয়া উঠে। এইরূপ হাসিতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। লোকে অনায়াসেই আমাকে ডাক্তারবাবুর ভৃত্য বলিয়া চিনিতে পারিল। আমি তাহাতে আরও লজ্জিত হইলাম। ক্রমে এই কথা ডাক্তারবাবুর কর্ণে গেল। তিনি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন। আমি কি করি, তাহারি সহিত পুনরায় ডাক্তারখানায় গমন করিলাম। কিন্তু আমার আর তথায় থাকিতে ইচ্ছা ছিল না। আমি ডাক্তারবাবুকে বলিলাম, আমি আর তথায় থাকিব না। আমার যে কিঞ্চিৎ প্রাপ্য ছিল, আমি তাহা ডাক্তারবাবুর নিকট চাহিলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে “নিমকহারাম” ইত্যাদি নানাবিধ গালি দিলেন। কিন্তু যিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ কাহিনী পড়িবেন, তিনি জানিতে পারিবেন, আমি তাঁহার তিরস্কারের ভাজন কি না।

ডাক্তারবাবু অপর যে সমস্ত তিরস্কার করিলেন, তাহা আর বলিবার নয়। আমি সমস্ত বরদাস্ত করিয়া থাকিলাম। প্রত্যুত্তরে একটা কথাও কহিলাম না। অবশেষে চারিটা বাজিবার সময় সুলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম যে, আর সুলোচনার

সহিত সাক্ষাৎ করিব না; কিন্তু মানবচরিত্র কতদূর মন্দ বলা যায় না। তখন আমার ইচ্ছা হইল, শেষকালে একবার দেখা করি। এমন সময় ডাক্তারবাবু—আমি যতদিন পীড়িত ছিলাম ততদিনকার বেতন কাটিয়া লইয়া—চারিটী টাকা পাঠাইয়া দিলেন। আমার তৎকালে হিসাব করিবার ক্ষমতা ছিল না, থাকিলেও করিতাম না। তাঁহার নিমক খাইয়াছি বলিয়াই মনে করিলাম—আর আমার তাঁহার আশ্রয়ে থাকা উচিত নহে। বাটীর অন্যান্য ভৃত্যেরা সকলে আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল, আমি কোন কথাই কহিলাম না।

পরে সুলোচনা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি যাবে? তোমার কি অসুবিধা হয়েছে? তোমাকে কি কেউ কোন অযত্ন করেছে? বিশেষ তুমি যে কাহিল, তুমি কেমন কোরে যাবে? আমি তো তোমাকে কখনও কোন অযত্ন করি নাই, তোমাকে কখনও কোন খারাপ কথাও বলি নাই। তুমি আমার জীবনদান করেছ, তাই তোমার যাওয়ায় আমার যে দুঃখ হবে, বোধ হয় অমন আর কারুর হবে না। তুমি বাবার কথা কিছু মনে কোরো না—উনি যেন আজকাল সর্ব্বদাই রেগে থাকেন। কাকে কি বলেন, তার ঠিক নাই। যদুদা', আমরা তো বাবার কথায় রাগ করি না; তুমি তো আমার দাদা,.. তুমি কেন রাগ কর্‌বে?" সুলোচনা যখন এই কথা বলিলেন, তখন তাঁর মুখভঙ্গি এরূপ স্নেহপূর্ণ, এরূপ সরল, এরূপ সুন্দর, এরূপ মালিন্যহীন যে,—তাঁহাকে তৎকালে যে দেখিত, সেই জানিতে পারিত—বুঝি এরূপ লক্ষ্মী পৃথিবীতে আর দুটী নাই। আমার মনে যে মালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়া গেল। কিন্তু কি জানি পাছে আবার কখন কিছু হয়, এজন্য আমি আর কাহারো মানা মানিলাম না। অপরের কথা দূরে থাকুক, সুলোচনার মানাও মানিলাম না। পাঁচটার গাড়িতে বারাকপুর ত্যাগ করিলাম।

ক্রমশঃ।

মৈথিলী সুন্দরী।

"মৈথিলী মেদিনী জয়ী হরিণ নয়নে,
বঙ্গ-বিলাসিনী দন্তে বসায় মদনে।"

বঙ্গ সুন্দরীর পার্শ্বে মৈথিলী সুন্দরী দাঁড়াইলে কেমন দেখায়? রূপসী ইহাঁরা উভয়েই, সে ত বটেই;—তা সে রূপের রীতি কেমন, সে সৌন্দর্য্যের 'তউল' কি? প্রশ্ন কঠিন বটে!

চাঁদে চাঁদে তুলনা—চলিবে কি? তরঙ্গে তরঙ্গে তুলনা—সম্ভবে কি? চাঁদ ত চাঁদই বটে,—এটীও চাঁদ, ওটীও চাঁদ; একটী চতুর্থীর আর একটী পঞ্চমীর নহে,—দুটীই পূর্ণিমার,—সমানে ষোলকলা। কার কত 'জলুস', মহাশয় বুঝিতে পারেন কি?—কার কোথায় খুঁত, আপনি ধরিতে পারেন কি? মাথা ঘুরিয়া যায়, চক্ষু ঠিক্‌রে পড়ে। দুই পার্শ্বে দুই মহাতরঙ্গস্রোতের শৈবালরূপী মনুষ্য আপনি,—খরটানে কোন্ লঙ্কায় গিয়া ছট্‌কে পড়িবেন,—তুলনা করিবেন কি!

রূপরাজ্যে নিউটন্ কখনও কেহ জন্মিয়াছিলেন কি না অবগত নহি। তবে তথাকার মহা মাধ্যাকর্ষণের কথা শুনিয়াছি বটে,—যুবাকালে, বোধ করি, কিঞ্চিৎ অনুভবও করিয়া থাকিব। কিন্তু সে আকর্ষণের "আপেক্ষিক ভারিত্ব" (?) নিরূপণের কোনও উপায় আবিষ্কার অদ্যাপি হইয়াছে কি না জানি না। সৌন্দর্য্য-সমালোচনা এ কলমে হইবে না,—এ বয়সে তাহা করিতেও চাই না। আমি,—"যদ্দৃষ্টং তথা লিখিতং"—উপকরণ আপনাদিগকে দিতেছি; যাঁর যেমন ইচ্ছা অভিরুচি ও আকাঙ্ক্ষা, 'উপপত্তি' করিয়া লউন।

বঙ্গ-অন্তঃপুর আপনি দেখিয়াছেন, নিঃসন্দেহ। অপরের না দেখিয়া থাকেন, নিজেরও ত দেখিয়াছেন। যাহা দেখিয়াছেন, অষ্ট-প্রহর অনবরত দেখিতেছেন, তাহা আর নাই দেখাইলাম। বঙ্গীয় অন্তঃপুর আপনি দেখিয়াছেন, মৈথিল অন্তঃপুর দেখেন নাই; তা আমিও দেখি নাই। কেমনে দেখিব, আমার স্কন্ধে একটীর অতিরিক্ত মস্তক নাই; থাকিলে

না হয় বারেক চেষ্টা করিতাম। মৈথিল অন্তঃপুর দেখি নাই, কিন্তু মৈথিলী দেখিয়াছি, মৈথিলী সুন্দরীও দেখিয়াছি। দেখিয়াছি—“শ্যামা চকোয়ার” ব্রতের দিনে। দেখিয়াছি—শরৎ হেমন্তের সন্ধিস্থলে, যখন——

“কার্ত্তিক পূরিত শশি দিবসে
সখী যুথি ভেয়ো আঙ্গনে আঙ্গনা
তাড়কি বিছিয়া নথিয়া ঝমকে
পরিপূরিত অঙ্গে সব গহনা
ঢোলক বোলে আমল তাঁহা
যাঁহা নাবী লিয়ে শ্যামা ভবিধামা
ওয়া বিচ্‌মে চুকিলা চমকে
মৈথিলী সব ভাযায়ত শ্যামা” *

তখন দেখিয়াছি। আর দেখিয়াছি—স্বচ্ছসলিলা কমলার সৈকত-গর্ভে, তটোপরি শ্যামল তৃণ-ক্ষেত্রে, যখন——

গাইয়ে মধুর সুমঙ্গল গীত
পূজেন কমলা-পদে মৈথিলী সুন্দরী
ভাসাইয়ে দ্বীপ-পুঞ্জ সুশ্যাম সলিলে,
দিয়ে ছাগী উপহার কুমারী† চরণে।
কমলা কোমল বক্ষে স্বর্ণ-দ্বীপ-শ্রেণী,
ভেসে যায় ধীরে ধীরে মৃদুল সমীরে
গায় সমস্বরে যত মিথিলার বালা
ছুটে সুকোমল কণ্ঠে সুস্বর লহরী ;—

---

* যুথি = জোঠ। তাড়কি = কানবালা। বিছিয়া = মল। চুকিলা = যে চুকলি করে।

† কমলানদী “কুমারী” অর্থাৎ অবিবাহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

“আসিয়াছি পূজিবারে তোমায় কমলে
আমরা ভগিনী তব মিথিলার মেয়ে
ধন-ধান্যে পূর্ণ কর মিথিলা প্রদেশ
আবার ওপদ সবে পূজিব আসিয়া।”

যখন চাঁদের এমনিতর হাটবাজার, তখন দেখিয়াছি। আবার যখন করে করে, স্বরে স্বরে মিলাইয়া মৈথিলী-মহিলা মণ্ডলাকারে রাজপথে বিবাহের ‘জল সইয়া’ গান গাইয়া গমন করেন, তখনও দেখিয়াছি। গৃহদ্বারে দেখিয়াছি, দ্বারের অন্তরালেও দেখিয়াছি ; অনেক স্থলে অনেক অবস্থায় মৈথিলী দেখা গিয়াছে। কিন্তু সুন্দরীর সাক্ষাৎ কি সচারাচর ঘটে ! সেটা সতেজ শুভগ্রহের ফল—স্বীকার করেন না কি ? “কচিৎ সে শুভগ্রহ আমাদের না ঘটিয়াছিল, এমন নয়। ছায়াবৎ, বিজলীবৎ, বিধিলিপিবৎ, সুসময়ের শুভক্ষণবৎ সুন্দরীকে সম্মুখ দিয়া সরিয়া যাইতে দেখিয়াছি। নয়ন-ধারণ সার্থক হইয়াছে, কিন্তু মহাশয়দিগের মনোরঞ্জন হইবে কি ? হইবে বলিয়া ত আমার বোধ হয় না। বিলক্ষণ সন্দেহই হয়। সে যাহা হউক, সে সুন্দরীর সংবাদ আপনাকে দি’ কি করিয়া। সে ত আর সাহিত্যসুন্দরী নয়, কাব্যসুন্দরীও নয়। মেধ-মাংস-অস্থি-মজ্জাময়ী স্বেদ-শোণিতময়ী অন্ন-ব্যঞ্জন-পরিপুষ্ট ষোল-আনা-সত্য-দেহবিশিষ্টা অত্যন্ত জীবন্ত সুন্দরী ইনি। এমনতর “সত্যকার” সুন্দরীর ‘সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষ’ করিয়া বর্ণনা করা প্রায় প্রাণসংশয় নয় কি ? প্রিয় মহাশয় ! ‘প্রাণ হাতে করিয়া’ দূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত সংক্ষেপেই এ কাজ সারা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। যদি না করিলে একান্তই না চলে, তবেই কর্ত্তব্য। নতুবা কদাচ কর্ত্তব্য নয়।

কবি বলেন,

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং—

* * * *

এমনিতর সুন্দরী কবির মতে "সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।" কিন্তু এখন সৃষ্টির প্রায় অন্তঃকাল উপস্থিত। এখনকার সুন্দরী ঠিক তখনকার সুন্দরীর মত হইলে কিরূপ দাঁড়াইতেন, বলিতে পারি না। কেন না, "তন্বী" অথচ "শ্রোণিভারাদলসগমনা" আবার "স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং" এমনতরটী আজও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি নাই। তা সেটা না হয় মনে মনেই গড়িয়া লউন; উক্ত রূপের এখনকার একটা সহস্রাধিক সপ্তবিংশ-কোটী সংস্করণ গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন। অস্থিমাত্র-অবশিষ্টা গাউনভার-প্রপীড়িতা শ্বেতাঙ্গনা বিলাতী বধূ ক্ষীণমধ্যা বটেন; কিন্তু সেটা বোধ করি 'কটিবন্ধের' কঠিন 'কসনে',। পরন্তু তিনি মাটীর দিকে "স্তোকনম্রা" অর্থাৎ কিনা ক্রোড়কুব্জা ইহাও ঠিক। কিন্তু কিজন্য, সেটা আপনারা নিজে নিজেই বিবেচনা করুন; আমি কিছু বলিতে চাই না। পক্ষান্তরে এই সুন্দরী 'অলসগমনা' তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু ইনি অলসগমনা কেন? শ্রোণী ত নাস্তি। অতএব অলসগমনা বস্ত্রালঙ্কারভারাৎ অথবা একান্ত-দুর্ব্বলতা-জনিত, সেটা বিবেচনার বিষয় বটে। তা আপনি এখন বলুন দেখি, এই কৃশাঙ্গী অবনতকলেবরা অলসগমনা সুন্দরীর কেমন রূপ! তবে এ কথা হইতে পারে—আর এ কথা গ্রাহ্য করিলেও করিতে পারি যে, আদ্যা সুন্দরীর এ সংস্করণ শত সহস্র যুগের সংঘর্ষণে বড় বেসিজিল হয়ে পড়েছে। আদিতে আদর্শ আসল ছিল, ক্রমে আসল,—নকলে নকলে অন্তে আসিয়া—কেমন একটা কিম্ভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাহা হউক "গুরু-নিতম্ব-উরু-পয়োধর," তন্বী তরুণীতে কিরূপে থাপে, একালে ঠাওর করা যায় না। তবে "তন্বী" বলিতে, বোধ করি, কলিকালের কৃশাঙ্গী নহে। কলির স্যাওড়া গাছটা দ্বাপরে ছিল সেগুনগাছ, সত্যযুগের ত কথাই নাই! অতএব কবির কথাই গ্রাহ্য। বিশেষতঃ এ কথা যেমন তেমন কবির নয়। এ কবি স্বয়ং সরস্বতীর বর বা বাঞ্ছা পুত্র কালিদাস—গুজরোদে খোদ। কবির আদর্শে মৈথিলীকে মাপিয়া মিলাইয়া যদি মহাশয় লইতে চান, মৈথিলী কিন্তু একটু মারা পড়িবেন। মৈথিলী ক্ষীণমধ্যা, এ কথা বলিতে আমি সাহসী নই; বলিলে, বলাটা সত্যও হইবে না। তবে কি মৈথিলী স্থূলমধ্যা? তাহাও নয়। মৈথিলীর মধ্যদেশ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শরীরের সমানুপাতে গঠিত। যিনি যেমনটী, তাঁর তেমনটী। মৈথিলীর মাংসপেশী মজবুত

ও মানান-সহি, শরীর সুগঠিত ও সুগোল। দীর্ঘও নয়, হ্রস্বও নয়, মৈথিলী মধ্যমাকৃতি। 'নিতম্বে তৈলঙ্গীকে পরাজয়' না করুন উক্ত দ্রব্য তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তাহা প্রচুরও বটে। মৈথিলী নেহাত তন্বী নহেন, "হাড়ে মাসে" মেধ-অস্থিতে জড়িত দিব্যকান্তি। 'শ্যামা'—সকল স্থলে নহেন; অনেক স্থলে "থির বিজুরীও" নহেন। কিন্তু সাধারণতঃ মৈথিলী-সুন্দরীরা বর্ণে গৌরী; আর সে গৌরবর্ণ বেশ উজ্জ্বলও বটে। "মৈথিলী মেদিনী জয়ী হরিণ নয়নে" এ কথা মিথ্যা বলিয়া আমার বোধ হয় না। কিন্তু তাঁর 'হরিণ নয়নে'—ঈষৎ নয়—যেন একটু অতিরিক্ত কজ্জল রঞ্জিত। কিন্তু সে চক্ষু চটুল বটে। 'কুটিল' কি না—মৈথিল মহাশয়েরা নিজেই বিবেচনা করিবেন। বিদেশীর পক্ষে সে বিবেচনার দিকে যাওয়া ভাল নয়। বঙ্গ সুন্দরীর 'দন্তের' এত গৌরব কেন, আমি বুঝিতে পারি না। তাঁর কি

'দশন মুকুতা জিনি কুন্দ'

অথবা 'মিশির' দরুণ মহার্ঘ কিম্বা সে দাঁতে বিষ বেশি! এ তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হই নাই। তা, তাঁর সে গরিমা বিন্দুমাত্রাও থর্ব্ব করিতে আমি প্রস্তুত নহি। যে হেতু আমার সমালোচ্য সুন্দরিদের দন্ত হইতে আমি সৌভাগ্যবশে সুরক্ষিত। অদৃষ্টে ও অসম্পূর্ণ দৃষ্টে আনুমানিক একটা বর্ণনা করা, আমার ইচ্ছা নয়।

'নিম্ন নাভি' সত্যই যদি সুন্দরীর লক্ষণ হয়, সে বিষয়ে মৈথিলী কাহারও অপেক্ষা ন্যূনা নহেন। নাভি নিম্নে ত বটেই, বস্ত্র তাহারও নিম্নে। বিদ্যাপতি অন্যত্র দেখিয়া

"শাঙর চিকুর ভার"

এবং

"চামর জিনি কুন্তল"

বোধ করি লিখিয়া থাকিবেন; কারণ উহা ত মিথিলায় নাই। প্রথম নম্বরে "চিকুরেরই" চরম অভাব, "শাঙর" ত তার পরের কথা। 'শাঙর চিকুর ভার' দেখিতে হইলে বঙ্গদেশেই যাইতে হয় এবং সেই

দেশেই পড়িয়া থাকিতে হয়। ভাগিরথি-পার হইয়া বেশী দুর আসিতে নাই। হুগলীর জলে কুন্তলের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি, মধ্য বঙ্গেই কবরীর শোভা। কেন, তাহা জানি না কিন্তু তুমি সমগ্র “মুলুকে হিন্দ্” ভ্রমণ করিয়া তেমনটী দেখিতে পাইবে না। সুন্দরী বিবিধ বর্ণের ‘হরেক কিছিমের’ দেখিবে, কিন্তু বাঙালিনীর’ কৃষ্ণ কুন্তলগুচ্ছের সে ভঙ্গিমা, সে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিশালিতা, কোথাও দেখিতে পাইবে না। না দেখিয়া নিশ্চয়ই দুঃখিত হইবে,—কারণ কুন্তলহীনতায় কমনীয় কুসুম-কান্তিও বার আনা রকম হ্রাস হয়। কি মর্ম্মভেদী দুঃখ, নিদারুণ বেদনা! প্রকৃতির এই আহ্লাদমাখা অত্যাচার, এই সুরসাল নিষ্ঠুরতা কেন, এই হৃদয়-বিদারক উদ্ভট-রচনা-রঙ্গ কেন, তুমি বলিতে পার কি?

আমি কিন্তু সৌন্দর্য্যের তুফানে, মিথিলা হইতে বড় বেশী দুরে গিয়া পড়িতেছি। তা কি করিব বলুন, তুফানের তৃণের এমনিতর দুর্গতিই হয়। তৃণ তরঙ্গে তিষ্ঠেও না, তলায়ও না, ‘আছ্‌ড়ে’ পড়ে, আর ‘আছ্‌ড়া-পিছ্‌ড়ি’ খায়।

মৈথিলীর মুখ ‘কনক-মুকুর জিনিয়া’ ‘শশি কিম্বা কমল জিনিয়া’ যা হয় একটা হইবে, কাযেই “জিনি বিম্ব অধর প্রবালে”। মুখটী ভাল হলে ওষ্ঠ দু’টীও ভাল হইয়াই থাকে। সে জন্য আর বেশী বকিবার দরকার দেখি না। মৈথিলীর মুখ মন্দ নয়; তার মানে—মুখে মাধুর্য্য আছে।

মৈথিলীর চেহারাটী মোটের উপর বেশ নরম নরম। কড়া কড়া কাটখোট্টা রকম নয়। পঞ্জাবে,—পশ্চিম প্রদেশে,—সৌন্দর্য্য ও সুন্দরী, অলি-গলিতে দেখা যায়। কিন্তু সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্যের খুব মিশা-মিশি মাখামাখিটা তথায় যেন অপেক্ষাকৃত অল্প। সুন্দরীরা যেন একটু মর্দ্দা মর্দ্দা। তাঁরা বীর-প্রসবিনী বলিয়াই কি তেমনতর? চড়া চড়া কড়া-কড়া ভাব মৈথিলীতে তত দৃষ্ট হয় না। স্বভাবতই সে চেহারা কোমল এবং একটু মিষ্টও বটে। কিন্তু সুন্দরীদের সম্বন্ধেই এ কথা; ‘বন্দরীদের’ পক্ষে নহে। বন্দরী মিথিলায়ও যেমন, মগধেও তেমনি;—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সর্ব্বত্রেই সমান। তা মহাশয়, আপনি এতে কিছু মনে করিবেন না; আমরাও এ কথায় কুণ্ঠিত নহি। কেন না—জানি যে, কেবল সুন্দরীতে সংসার চলে না; অসুন্দরীরাই এ সংসারের অস্থি-মজ্জা-প্রাণ—লক্ষ্মী এবং

সরস্বতী। তাঁদেরই গৌরব সর্ব্বোপরি। সুন্দরীরা সংসারে সৌখিনের আসবাব বলিলেই হয়।

মৈথিলী-মহিলা সুন্দরী বটে। কিন্তু বস্ত্র পরেন বাইশ হাত কিম্বা তারও বেশী। এক এক জন এক একটী ‘লং ক্লথ”! ধৌত-কার্য্যেও শুনিয়াছি তাদৃশী অভ্যস্থা নহেন। * * * কলিকাতায় “বাঙ্গালিন্‌দের” ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও গঙ্গার ঘাটে পূজার ঘটা দেখিয়া নাকি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, শুনিয়াছি নাকি খুব সুখ্যাতিও করিয়াছিলেন।

মৈথিলীর শিঙারে—কি না বেশবিন্যাসে—সিন্দুরের খরচ অত্যন্তই অতিরিক্ত। বিদ্যাপতি,

‘সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু’

গাইয়াছিলেন কি মিথিলায় বসিয়া? কখনই না। সেথা ত সিন্দুরের বিন্দু নয়; সিন্দুরের সে এক একটী সিন্ধু।

মৈথিলীর সহিত মাগধীর যতটা সৌসাদৃশ্য, বঙ্গনারীর ততটা নয়। মৈথিলী চৌদ্দ আনা মাগধী, এবং দুই আনা আন্দাজ বাঙ্গালিনীর ভাবসম্পন্না। এ দু’-আনা বাঙ্গালা-ভাব মৈথিলীতেই কেবল আছে, মাগধীতে নাই।

তিন খানি ছবি।

১

মরি, কি সুন্দর! দ্বিতীয়ার শশী
সোণার পুতলি শিশুটী ওই!
হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া;
কোথায় বসন? ভূষণ কই?
হেম হিমাদ্রির কাঞ্চন-শৃঙ্গেতে
সোণার উদ্যানে স্বর্ণালয়;
শিশুটী বেড়ায় কাঙ্গালের মত;
সে যেন উহার কিছুই নয়।

ধন-অভিমান নাহি শিশু-মুখে,
ধন-আভরণ অঙ্গেতে নাই।
পাগলের মত যাইছে চলিয়া,
কি যেন ভাবিছে, কি যেন চাই।
আপনা-আপনি কহিতেছে কথা,
আপনার মনে আপনি হাসে।
সরলতা-মাখা সে ক্ষুদ্র মু'খানি
সরলতা ক্ষুদ্র অধরে ভাসে।
হৃদয়টী ক্ষুদ্র দয়ার নিঝর
পর দুঃখে ক্ষুদ্র ধারায় বয়।
ফুটিছে অস্ফুট কি উচ্চ উচ্ছ্বাস!
শিশুটী যেন বা ধরার নয়।
বসি অন্তরীক্ষে কহে ভাগ্য-দেবী,
"এতই প্রসাদ করিনু দান,
"নাহি অভিমান, রহিলি উদাস,
"কত উচ্চ তোর দেখিব প্রাণ!"

২

নীল সিন্ধু-নীরে শ্বেতদ্বীপ-তীরে
বসিয়া যুবক কে?
আশার অঙ্কেতে হইয়া শায়িত
কি স্বপ্ন দেখিছে সে?
হৈম হিমালয়-শৃঙ্গে, হৈম অট্টালিকা-অঙ্কে
সুখের মূরতি যুবা বসি।
প্রথম যৌবনোচ্ছ্বাসে কি গৌরব পরকাশে!
আজি শিশু অষ্টমীর শশী।
দেখিতেছে ভবিষ্যত— যেন স্বচ্ছ ছায়াপথ—
কীর্ত্তির তারকা-ঝলসিত,
যশের সৌরভ বাসি আকাশে যাইছে ভাসি
পুণ্য সমীরণে প্রবাহিত।

পাগল শিশুটী আজি হইয়াছে শান্ত স্থির,
পবিত্র হৃদয় নির্ঝরিণী
হইয়াছে মাতোয়রা জগতের দুঃখরাশি
যুড়াইতে, সন্তাপ হারিণী।
কি বিরাট শব্দ ওই! হইল কি বজ্রাঘাত
অকস্মাৎ? যুবা চমকিল,—
সেই সম্পদের শৃঙ্গ, সেই স্বর্ণ অট্টালিকা
বিচূর্ণিত, আকাশ ছাইল!
গগন হইতে যুবা পড়িল ভূতলে যেন,
সম্মুখে বিপদ পারাবার,—
নাহি অন্ত, নাহি কুল, কি তরঙ্গ সমাকুল!
সে পুরীর চিহ্ন নাহি আর।
ভাগ্যদেবী শূন্যে বসি, কহে খল খল হাসি—
"এখন কেমন, বাছা মোর!
"পড়িল না এ ঐশ্বর্য্যে একটী কলঙ্করেখা?
"সে উচ্চ হৃদয় কোথা তোর?"
"কোথায়?"—নির্ভয়ে যুবা কহে বক্ষ দেখাইয়া—
"পাষাণি রে! দেখ্ সে হৃদয়।
"ঢাল্ ঝড় বজ্র তোর; উচ্চ পুণ্যপথ হতে
"এ হৃদয় টলিবার নয়।
"ওই স্বর্ণরাজ্য, পুরী পিতার সৃজন মম,
"আমি সেই পিতার সন্তান;
"তাঁর পুণ্য-পদ-ছায়া হৃদয়ে করিয়া ধ্যান,
"কটাক্ষেতে করিব নির্ম্মাণ।
"স্বর্ণ-পুরী শ্রেষ্ঠতর, পুণ্যেতে পবিত্র ভিত্তি
"স্থাপন করিয়া দৃঢ়তর—
"ধর্ম্মচূড়া সুদর্শন করিবে স্বর্গ চুম্বন
"নীল নভে যেন শশধর।
"পবিত্র ছায়ায় তার তাপিত পাইবে শান্তি,
"তৃষাতুর—নীর সুশীতল;

"স্বদেশের, স্বধর্ম্মের, সেই চূড়া সুদর্শন
"হবে অবলম্বন প্রবল।
"বিদীর্ণ বোমের মত দেখিব কেমনে তুই
"উড়াইবি সে পুরী আমার।
"দিনু ঝাঁপ,—নাহি ভয়; বুকে উচ্চ আশা, শিরে
"বিপদ-ভঞ্জন হরি যার।"

৩

সিন্ধু-পূর্ব্ব-তীরে স্বর্ণ-শেখর-মালায়
কিবা পূর্ণচন্দ্র আজি, মরি! শোভা পায়!
ক্রমে দ্বিতীয়ার শশী, চন্দ্র অষ্টমীর,
পূর্ণ-চন্দ্রে পরিণত! নীল-সিন্ধু-নীর
কি আনন্দে প্রতিবিম্ব করিয়া ধারণ,
তরঙ্গে তরঙ্গে তাহা করিছে চুম্বন!
পর-দুঃখ-কাতরতা হৃদয়ে তাহার
চন্দ্রের কলঙ্ক মত শোভার আধার।
দয়ার কৌমুদিরাশি অজস্র ঝরিয়া
তৃষিত তাপিত প্রাণ যায় যুড়াইয়া।
পদে সম্পদের রাশি শৈলমালা মত
চরণে ঠেলিয়া তাহা হতেছে উন্নত।
সরলতা—উচ্চতায়, স্নেহে সুশীতল,
হৃদয় দয়ার উৎস পূর্ণ ঢল ঢল।
অঙ্কে মুক্তকেশী ওই রোহিনী বসিয়া,
মুক্তকেশরাশি চন্দ্র-বক্ষ আঁধারিয়া।
শিশুর জীবনাভাস, যৌবন স্বপন,
বিপদের সে প্রতিজ্ঞা—হয়েছে পূরণ।
কহে ভাগ্যদেবী, মুখে প্রীতি সমুজ্জ্বল—
"কে বলে বীরত্ব নর-হত্যায় কেবল?
"উত্তাল বিপদার্ণব করিয়া লঙ্ঘন
"যে যায় সুখের পার—বীর সেই জন।

"পশুত্ব, দেবত্ব,—দুই সম্পদের ফল।
"ধরাতলে পশুত্বই দেখিবে কেবল।
"যে পারে দলিতে পদে পশুত্ব এমন,
"বৎস! সে প্রকৃত ধনী, দেবতা সে জন।"

পুষ্পহার।

হায় মা! দিয়াছ তিন খানি ছবি,
কি দিব তোমায় আর?
তিন খানি ছবি দিলাম আঁকিয়া
লও বিনিময়ে তার।
জান মা, কবিরা দরিদ্র জগতে;
তাদের সম্পদ সার—
মুক্তকেশী ওই প্রকৃতী জননী,
পূর্ণচন্দ্র কণ্ঠহার।
মাতা—বন-ভূমি; তুলি বন-ফুল
গাঁথিলাম এই মালা।
মাঝখানে তার তিন খানি ছবি
জগত করিয়া আলা।
অর্পিলাম করে এ দরিদ্র-মালা;
পর গলে একবার,
কল্পনা-নয়নে হৃদয় ভরিয়া
দেখি শোভা, মা! তোমার।
আশীর্ব্বাদ করি, ওই পূর্ণচন্দ্র—
হৃদয়েতে, মা! তোমার,
ক্ষুদ্র তারা-গুলি অঙ্ক উজ্জ্বলিয়া
শোভে যেন অনিবার।
আপনি, মা! তুমি আকাশের মত
পবিত্র শান্তির ছবি,
বিরাজ, মা, স্নেহে আবরি জগত,
আশীর্ব্বাদ করে কবি।

ওই শিশুগুলি,   নক্ষত্র তারকা,
অঙ্কে তব অনুপম ;—
এই তিন খানি   ছবি, মা, তাদেরে
দেখাইও অনুক্ষণ।
দেখাবে শৈশবে,   দ্বিতীয়ার চন্দ্র—
শিশু-ছবি মনোহর ;
দেখাবে কৈশোরে,   অষ্টমীর চন্দ্র—
মেঘাচ্ছন্ন ঘোরতর।
পূর্ণ-চন্দ্র ছবি   দেখাবে যৌবনে
মহিমা গৌরবাধার।
বৃহ পূর্ণ-চন্দ্রে   যেন এক দিন
ঝলসে অঙ্ক তোমার।
আবার আবার   আশীর্ব্বাদ করি—
সীতা সাবিত্রীর মত,
সংসার মরুতে   অমৃত ঢালিয়া
সাধ, মা ! রমণি—ব্রত।

নবীন।

কঙ্গ্রেস।

প্রজা-শক্তি রাজ-শক্তির প্রতিযোগী নয়, তাহার প্রতিকূলও নয়, বিরোধীও নয় ; তাহার অন্যতম অংশ। প্রজা-শক্তি রাজ-শক্তির রূপান্তর মাত্র। সুস্থ এবং সবল শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুস্থ এবং সবল,—ক্ষুদ্রতম অঙ্গুলিটীও শক্তি-সম্পন্ন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শরীরের বিরোধী নয়,—শরীরের সহকারী, শরীরেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মূল শরীর হইতেই শক্তি সংগ্রহ করে—শরীরেরই সহায়তার জন্য ; তাহার ধ্বংসের জন্য নহে। শরীর-ধ্বংসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিরও ধ্বংস,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সমষ্টিতেই শরীর। জীব-শরীরের ন্যায়, সাম্রাজ্য-শরীরেও ঐ কথা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিবিহীন শরীর যেমন সম্ভবে না, সম্ভব হইলেও তাহা যেমন এক উৎকট অব্যবহার্য্য অকর্ম্মণ্য দ্রব্য ; তদ্রূপ প্রজাবিহীন রাজা অসম্ভব। সম্ভাবিত হইলেও তাহা আকাশ-কুসুমবৎ কেবল একটা নামমাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষ সহযোগে বিশ্বসংসার, বিশ্বসংসারের ব্যাপ্তি এবং স্থিতি। প্রকৃতি-বিবর্জ্জিত পুরুষ উচ্চাদপি উচ্চ স্থানে অবস্থিতি করুন পরিদৃশ্যমান পৃথিবীতে, প্রত্যক্ষ জাগ্রত পাপপুণ্যময় সংসারে তাঁহার অধিকার নাই।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিশ্রনের ন্যায়, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংশ্লিষ্টতার ন্যায়, রাজা ও প্রজা সংযোগে সাম্রাজ্য। প্রজা লইয়াই রাজা। রাজা-প্রজার অস্তিত্বজনিতই রাজত্ব ; প্রজা-শক্তির সমষ্টিই রাজ-শক্তি বা রাজকীয় শক্তি। প্রজাবিরহিত রাজা বা রাজ্য যেমন সম্ভবে না, তেমনি রাজা বা রাজ-শক্তির বিরহে রাজত্বমাত্রই অসম্ভব। প্রজাতন্ত্র রাজ্যেও রাজ-শক্তি (যাহার অপর নাম রাজা) আছে। রাজা বা রাজকীয় শক্তি ব্যতিরেকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয় না, সমাজেও শৃঙ্খলা থাকে না। সাম্রাজ্য ও সমাজমাত্রেই শাসন আবশ্যক,—শাসন পালনেরই নামান্তর। যে শাসন-প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট রাজা নাই, তাহাতেও রাজকীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। রাজ-শক্তি ব্যতিরেকে প্রজা-শক্তি সুচালিত হয় না। প্রজা-শক্তির ন্যায় রাজ-শক্তি স্বাভাবিক। এতদুভয় শক্তির সহযোগে ও সমীকরণে শৃঙ্খলা-সম্পন্ন ও শান্তিময় সাম্রাজ্য,—স্বাস্থ্যকর শাসন।

যে সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খল, শান্তিময় ও সুস্থকায়, তথায় প্রজা-শক্তি রাজ-শক্তির ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত ও বলশালিনী। প্রজা-শক্তি তথায় রাজ-শক্তির প্রতিযোগী নয়,—পরিপোষক।

প্রজা-শক্তি লইয়া রাজ-শক্তি। ইহা সমষ্টিভাব। অর্থাৎ প্রজা সমূহের সমষ্টিত শক্তিই রাজ-শক্তি। পক্ষান্তরে এই সমষ্টিত শক্তি ব্যষ্টিভাবে সাম্রাজ্যশরীরে সঞ্চালিত হইয়া তাহার সর্ব্বত্র শক্তি সঞ্চার করে। প্রত্যেক প্রজা, প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও পরিমান অনুসারে রাজকীয় মহাশক্তি হইতে, শক্তি সংগ্রহ করে। সুস্থ ও সবল শরীরে,—যেমন মস্তক হইতে অঙ্গুষ্ঠ অবধি সর্ব্বত্রই শক্তিসমাবেশ, একই শক্তির

স্বাভাবিক সঞ্চালন; সুস্থ ও সবল সাম্রাজ্যেও সেইরূপ। যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যতটুকু বলের প্রয়োজন তাহাতে ঠিক ততটুকুই থাকে, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। মস্তকের বল চরণে থাকে না, বাহুর বল অঙ্গুলিতে থাকে না, কিন্তু বল সর্ব্বত্রই থাকে।* সাম্রাজ্যমধ্যে, সমাজ-পতির শক্তি এবং সত্ত্ব হইতে সামান্য প্রজার শক্তি এবং সত্ত্ব অবশ্য পৃথক্ এবং সেই পার্থক্যের ন্যায় তাহার পরিমাণেরও তারতম্য। কিন্তু শক্তি এবং সত্ত্ব উভয়েতেই বিদ্যমান; বিদ্যমানতা আবশ্যক। যেস্থলে যে প্রকৃতির ও পরিমাণের শক্তি এবং সত্ত্বের প্রয়োজন, সেস্থলে সেই প্রকৃতির ও পরিমাণের শক্তি এবং সত্ত্ব থাকে। থাকিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে ও স্বতন্ত্রভাবে মূলশরীরের মঙ্গল সাধন করে। জীবশরীরে যে বন্দোবস্ত, সাম্রাজ্য শরীরে তাহার অন্যথা নহে। সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে শরিরী। প্রকৃতি-পুরুষে সৃষ্টি, রাজা-প্রজায় রাজ্য। শেষোক্ত প্রথমোক্তের অপর এক অভিনয়।

সংসারে সুস্থ ও সবল শরীরের ন্যায় অসুস্থ ও দুর্ব্বল শরীরও আছে; রুগ্ন ও ভগ্ন শরীরও আছে। অস্বাভাবিক শরীরও আছে। বিকলাঙ্গ ও অর্দ্ধাঙ্গ দেহও আছে। সুস্থ ও সবল শরীরে যেরূপ স্বাভাবিক সুশৃঙ্খলার সহিত শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; অসুস্থ ও অস্বাভাবিক, রুগ্ন ও ভগ্ন শরীরে অবশ্য সেরূপ হয় না। কিন্তু সুস্থ ও সবল শরীরই বাঞ্ছনীয়। শরীর অনিয়মে অসুস্থ হইলে ঔষধাদিতে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্বথা প্রয়োজন। নৈসর্গিক বিপাকে শরীর বিকলাঙ্গ, বিকৃত বা বিকাশ-বিরহিত হইলে, তাহারও চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে।

জীবশরীরের ন্যায় সাম্রাজ্য-শরীরেরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সাম্রাজ্য-শরীরও অসুস্থ অস্বাভাবিক রুগ্ন ভগ্ন বিকলাঙ্গ ও ব্যাধিগ্রস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের ন্যায় সাম্রাজ্যেরও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রয়োজন এবং তাহার ব্যবস্থা ও চিকিৎসা আছে। রোগ নিবারণ এবং শান্তির জন্যই চিকিৎসা। কিন্তু চিকিৎসা নানা প্রকৃতির, ও চিকিৎসকদিগের প্রকৃতি-অনুসারে চিকিৎসার প্রকৃতিভেদ। ইয়ুরোপের অনেক স্থলে সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বা উৎপাদনের অভিপ্রায়ে যে প্রকৃতির রাজনৈতিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বথা কু-চিকিৎসা। সে চিকিৎসায় পৈশাচিক রক্ত-মোক্ষণ-প্রণালী; তদ্দ্বারা রোগনিবারণ ও স্বাস্থ্য-উৎপাদন কোন ক্রমেই হইবে না; শরীর ক্ষতবিক্ষত ও প্রাণ বহির্গত হইবে। সোশিয়ালিষ্ট্ নিহিলিষ্ট্ প্রভৃতি সম্প্রদায় গণ্ডমুর্খ গো-বৈদ্য,—গো-বৈদ্যের মধ্যেও গোঁয়ার। তাঁহাদিগের হস্তে, রাজ-শক্তিও প্রজা-শক্তি উভয়েরই অপঘাত-মৃত্যুর সম্ভাবনা। অপঘাত-মৃত্যু অপেক্ষা অসুস্থ শরীরও বাঞ্ছনীয়।

স্বাভাবিক নিয়ম-ভঙ্গে স্বাস্থ্যভঙ্গ।

শক্তি-সামঞ্জস্য ও শক্তি-সাম্য স্বাভাবিক। শক্তির সামঞ্জস্যে ও সাম্যে সংসারের স্থিতি ও সংসারের শান্তি। শক্তির বৈষম্যে ও বিপর্য্যয়ে প্রলয়। যে শক্তির সংমিশ্রনে ও সমতায় সৃষ্টির বিকাশ,—সেই শক্তিরই ব্যভিচারে ও বৈষম্যে সৃষ্টির বিনাশ। সৃষ্টি ও প্রলয়, বিকাশ ও বিনাশ একই শক্তির বিভিন্ন লীলা।

সত্ত্ব-রজঃ-তম ত্রিধা-শক্তি একই মূলাধার শক্তির বিভিন্ন পর্য্যায়। রাজ-শক্তি ও প্রজা-শক্তি উভয়েই সাম্রাজ্য-সম্ভূত একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। সত্ত্ব, রজঃ, তম—তিন শক্তির সংমিশ্রণ ও সমতায় সৃষ্টি এবং সৃষ্টির স্থিতি। রাজ-শক্তি ও প্রজা-শক্তির সাম্য ও একীকরণে সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের শান্তি। সমাজই হউক বা সাম্রাজ্যই হউক উহা স্বাভাবিক সৃষ্টি, অতএব স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না; কোন কালেই হয় নাই। শক্তি-সঙ্কোচে সংক্ষোভ চিরকালই ঘটে, শক্তি-বৈষম্যে বিপ্লব—নূতন কথা নহে।

‘প্রজা-শক্তি রাজ-শক্তির প্রতিকূল নয়, প্রতিযোগী নয়; প্রত্যুত তাহার পরিপোষক। প্রজা-শক্তি রাজ-শক্তির রূপান্তর।’ দুর্ব্বল প্রজার রাজাও দুর্ব্বল; এবং এতদুভয় মিলিত রাজ্যও শক্তিহীন। সেনা-শক্তি স্বাভাবিক শক্তি নহে;—সুরার বল শরীরে কতক্ষণ স্থায়ী? প্রজাশক্তি-বিরহিত সৈন্য-শক্তি-সম্ভূত ও সংরক্ষিত সাম্রাজ্য মাদক-সেবী মনুষ্য-শরীরের ন্যায়। মাদকদ্রব্যের উত্তেজনা-জনিত যে শক্তি—শক্তিই যদি তাহাকে বলা যায়—তাহা অস্বাভাবিক উন্মাদকর ও অচিরস্থায়ী।

---

* জীব শরীরে যেমন সকল ইন্দ্রিয়েরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী শক্তি এবং সত্ত্ব আছে সাম্রাজ্য শরীরেও তদ্রূপ।

মাদকসেবনে কখনও কোনও শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয় নাই। সৈন্যবলে ও সৈন্যমাত্র-সম্বলে কখনও কোন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই।

ইয়ুরোপীয়েরা বলেন রাজা প্রজার সেবক;—প্রজাপালনার্থে প্রজাকর্ত্তৃক নিয়োযিত। এ সম্বন্ধ আমরা অনুমোদন করি না; যেহেতু ইহা অস্বাভাবিক। ইয়ুরোপীয় অনেকজাতি রাজাপ্রজার অস্বাভাবিক সম্বন্ধস্থাপন করিতে যাইয়া অসীম অশান্তি-সাগরে পতিত হইতেছেন। তাঁহাদের প্রজা-তন্ত্র, সাধারণ-তন্ত্র, সাম্যবাদ,—সমস্তই রসাতলের দিকে প্রধাবিত।

রাজা প্রজার সম্বন্ধ আমরা অন্যরূপ বুঝি। আমাদিগের শাস্ত্র এবং সংস্কার তাহা অন্যরূপ বুঝায়। আমরা যাহা বুঝি, আমাদিগের শাস্ত্র এবং সংস্কার যাহা বুঝায়,—তত্ত্ব না বুঝিয়া কূট তার্কিক তাহা ভ্রান্ত বলিবেন বলুন,—কিন্তু তাহা নিরাপদ নির্ব্বিঘ্ন। হইতে পারে তাহার পরিণাম—অধীনতা বা অবসন্নতা; কিন্তু অশান্তি তাহার পরিণাম নয়। সংসারে সমাজে সাম্রাজ্যে শান্তি সর্ব্বাগ্রে পূজনীয়া।

রাজা প্রজা উভয়েরই অভ্যুদয় স্বাভাবিক। কেহ কাহাকে নিযুক্ত করে না। রাজা প্রজার সেবক নহেন; প্রজাই রাজার সেবক ও পরিচারক। রাজা প্রজার প্রতিপালক এবং পিতাস্বরূপ। দেবভক্তির ন্যায় রাজভক্তি মনুষ্যহৃদয়ের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি; এবং মনুষ্যত্বসাধনকল্পে উক্ত বৃত্তি অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু উহার অনুশীলনে প্রচুর আনন্দ। দেব-অংশ ও পিতৃ-অংশের ন্যায় রাজ-অংশও পবিত্র। উহা প্রদান না করিলে প্রত্যবায় আছে,—অসম্মানে পাপ স্পর্শে। রাজার প্রতি প্রজার এই বিধি, এই ব্যবহার। পক্ষান্তরে প্রজার প্রতি-রাজার বিধি ও ব্যবহারও তদুপযোগী। প্রজার হিতার্থে রাজা প্রতি পদে আত্মত্যাগে বাধ্য। মহারাজা রামচন্দ্র প্রজা-পুঞ্জের প্রীতিবর্দ্ধন বা সংশয়চ্ছেদনার্থে প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে ভার্য্যা সামান্যা ভার্য্যা নহেন। সহধর্ম্মিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, বনবাস-সহচরী স্বয়ং লক্ষ্মী সাধ্বী সীতা!

রাজা-প্রজার সম্বন্ধ আমরা এইরূপ বুঝি। আমাদের শাস্ত্র এবং সংস্কার এইরূপ বুঝায়। তা রাজা আর্য্যই হউন আর ম্লেচ্ছই হউন; স্বদেশীয় স্বজাতীয় হউন বা বিদেশীয় বিজাতীয় হউন। রাজা—সর্ব্বথা রাজা,—দেবতার সমতুল্য। আমাদিগের নিকট রাজা প্রজার 'আদর্শ' সম্বন্ধ এই; এবং এই সম্বন্ধই স্বাভাবিক, অতএব উপযুক্ত।

আমাদের আদর্শ "সাম্রাজ্য-নীতি" অর্থাৎ রাজনীতি ও প্রজানীতি উভয়েরই ইত্যগ্রে অংশত উল্লেখ করিয়াছি। যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অবশ্য মূলকথা মাত্র। 'মূল' স্থির থাকিলে শাখাপ্রশাখা তাহারই অনুরূপ হয়। পুষ্প-পত্র-পল্লব মূলবৃক্ষেরই অনুরূপ। অতএব তত্তৎ বিষয়ের অধিক আলোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়।

রাজ-শক্তি এবং প্রজা-শক্তির সম্যক্ স্বাভাবিক ক্রিয়া—আমাদিগের আদর্শ রাজনীতি। সেই ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদনার্থে দেশ কাল ও অবস্থা অনুসারে রাজকীয় বিবিধ বিধি ব্যবস্থা সৃষ্ট ও গঠিত হয়,—হওয়া আবশ্যক হয়। আদর্শ মূলনীতি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে বিধিব্যবস্থাও তদনুরূপ হয়।

এখন তর্ক উঠিতে পরে, প্রত্যক্ষ আদর্শের অনুরূপ হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ প্রতি দৈনিক দুর্ব্বল-মনুষ্য-পরিচালিত, বহুবিধ বিভিন্ন স্বার্থ বিজড়িত বহুলোকের ব্যাপার, তাহা সূক্ষ্ম সুগঠিত আদর্শের সমতুল্য কোথায়? স্থূল-প্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম-আদর্শ হইতে স্বভাবতই অনেক অন্তরে। থিওরি প্র্যাক্টিসে পরিণত হওয়া কঠিন। ইহা স্বীকার করি। আদর্শে এবং প্রত্যক্ষে প্রভূত প্রভেদ ইহাতে সংশয় নাই। প্রত্যক্ষ প্রায়ই আদর্শের সমতুল্য হয় না। সমতুল্য দূরের কথা, আদর্শের পূর্ণ প্রতিবিম্বও হয়ত প্রত্যক্ষে নিপতিত হয় না। এ কথা সত্য, আনুমানিক সত্যও নহে, স্বীকার্য্য সত্যও নহে; সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সত্য—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত—আদর্শের এবং প্রত্যক্ষের বিভিন্নতা। তবুও কিন্তু আদর্শ অপরিহার্য্য। কেবল অপরিহার্য্য নয়, অত্যাবশ্যক; অত্যাবশ্যক বলিয়াই অপরিহার্য্য। আদর্শ অবলম্বন না করিয়া মনুষ্য জীবনপথে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। প্রতিপদবিক্ষেপে আদর্শের গঠন, অনুশীলন ও অনুকরণ করিতে হয়; এবং ইহা করা হয় বলিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব; নতুবা মনুষ্যে এবং পশুতে বোধ করি প্রভেদ থাকিত না। ইহা সহজ কথা; সত্য এবং নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। অতীত এবং বর্ত্তমান ইহার সাক্ষী। ইহা নূতনও নহে—বহুকালের পুরাতন বৃত্তান্ত। পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা কর, এই কথা পাইবে,

বর্ত্তমান বিশ্লেষ কর, এই কথা আসিবে। আদর্শের অনুসরণ করিয়া তুমি মনুষ্য।

হিন্দুর আদর্শ তাহার শাস্ত্র। শাস্ত্রসম্বন্ধে মতভেদ আছে, মতান্তর থাকুক। শাস্ত্রের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ আছে;—কোন্ আদর্শের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নাই? সে কথা হইতেছে না। হিন্দুর আদর্শ শাস্ত্র। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু "শাস্ত্রানুসারে চলেন"—শাস্ত্রের অনুশীলন এবং অনুসরণ করেন। শাস্ত্রের আদর্শ সাংসারিক জীবনে আংশিকমাত্র প্রতিফলিত হয়, শাস্ত্রাদেশ ষোল-আনা রকম কার্য্যে পরিণত হয় না। তাই বলিয়া কি হিন্দু তাঁহার শাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন? অথবা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু-নামের উপযুক্ত হইতে পারেন? শাস্ত্রে এবং সংসারে মিলিল না, মিলাইতে পারিল না, তাই বলিয়া শাস্ত্র পরিত্যজ্য নয় এবং সেটা বোধ করি শাস্ত্রেরও দোষ নয়। হিন্দুর শাস্ত্রের ন্যায় সভ্য অসভ্য সকল জাতির সকল সমাজের এবং সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় একটা না একটা আদর্শ আছে। যাহার নাই, তাহাকেও একটা গঠন করিতে হয়; নহিলে জীবন চলে না। আদর্শ হইলেই যে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ষোলকলায় সম্পূর্ণ, নিখুঁত ও নির্দ্দোষ হইবে, এমত অবশ্য হইতে পারে না। আদর্শ অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ ও উন্নতি-সাপেক্ষ হইতে পারে। তা হউক, তজ্জন্য আদর্শের আবশ্যকতার লোপ হয় না।

আদর্শ অনুসরণ করিয়াই কি তোমার সমাজ সভ্যতা সাহিত্য শিল্প সাম্রাজ্য নয়? যে পরিমাণে তুমি আদর্শের অনুকারী ও তাহাতে কৃতকার্য্য, সেই পরিমাণে তুমি মনুষ্যনামের উপযুক্ত; তাহার অতিরিক্ত এক বিন্দুও নও। প্রত্যক্ষে বা প্র্যাক্‌টিসে যতটুকু প্রকৃতিস্থ, উচ্চতা ও উদারতা, তাহা আদর্শ-অনুসরণেরই ফল। মনুষ্য-মনের এবং দেহের পশুত্ব যতটুকু অদ্যাবধি প্রশমিত হইয়াছে তাহা আদর্শেরই আশীর্ব্বাদে। তোমার আধ্যাত্মিক রাজ্যে ও আদর্শ, বৈষয়িক কার্য্যেও আদর্শ আছে, তাই তুমি এখনও টিঁকিয়া আছ। নতুবা তোমার "স্বত্ব এবং স্বার্থ", শৃঙ্খলা সুখ এবং শান্তি,—তোমার মনুষ্যত্ব এতদিন রসাতলে প্রবেশ করিত। সংসারের নীচতা ও অস্বাভাবিক স্বার্থ-পরতার মধ্যে আদর্শ তোমার একমাত্র সুদৃঢ় অবলম্বন; আদর্শের ঈষদ্ আবছায়া তোমার সমাজ ও সাম্রাজ্যশরীরে ন্যূনাধিক পতিত হইতেছে

বলিয়াই এখনও তোমার জীবনধারণ। আদর্শ স্বপ্ন নয়, কল্পনার কুহকও নয়।

অস্বাভাবিক স্বার্থ-পরতা মনুষ্য-স্বভাবের কলঙ্ক। সে কলঙ্ক কখনও অপনীত হইবে কি না জানি না। কিন্তু ইহা জানিও যে, অমিশ্র স্বার্থ-পরতায় সংসার চলিতেছে না। স্বার্থ-পরতার সংঘর্ষণ যতই দেখ না, তাহা কোন সমাজের ও কোন সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি নহে, স্বাভাবিক নিয়মে হইতেই পারে না। পরার্থ-পরতার পৃষ্ঠবলে ও পবিত্র আবহাওয়ায় পৃথিবী দণ্ডায়মান। পরার্থ-পরতা আছে বলিয়াই তোমার ক্ষুদ্র স্বার্থটুকু এখনও মাথা উঁচু করিয়া বজায় আছে। তুমি বলিবে, পরার্থ-পরতাও স্বার্থ-পরতাজনিত। নিজের স্বার্থরক্ষার্থেই রাম শ্যামের স্বার্থে অধিক আঘাত করে না। মানিলাম তাহাই হইল। কিন্তু কথাটা কি সত্যই তাই? এরূপ ক্ষুদ্রতার এবং নীচতার বনিয়াদের উপর কি কখনও একটা সুমহৎ জাতি একটা সমুন্নত সাম্রাজ্য গঠিত হইতে পারে? সংকীর্ণচেতা তুমি আমি যাহাই মনে করি না, বিষয়টা কিন্তু অন্যরূপ। লর্ড রিপণ বলিয়াছিলেন "Righteousness exalteth a nation" কিন্তু কথাটা একটু মূল হইতে ধরিলে বলিতে হয়, Righteousness evolveth a nation. Righteouness preserveth a nation. বুঝিয়া দেখিলে, ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই সারবান্ দ্রব্য সৃজন ও ধারণ করিতে পারে না। অধর্ম্মে একটা সামান্য মুদিখানার ব্যবসা চলে না; তুমি বলিতে চাও, একটা সম্রাটের সাম্রাজ্য চলে!!!

নীতিমাত্রই আদর্শসম্ভূত। রাজনীতি বা সাম্রাজ্য-শাসননীতি আদর্শের অতীত ও বহির্ভূত নহে। দেশ কাল পাত্র ও রাজা-প্রজার চরিত্রভেদে বহুবিধ রাজনৈতিক আদর্শ আবহমানকাল হইতে অঙ্কিত ও অনুকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রজাতন্ত্র-শাসন ও যথেচ্ছাচার-শাসন উভয়েরই অন্তরালে উৎকৃষ্ট হউক অপকৃষ্ট হউক একটা আদর্শ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আদর্শ যে প্রকৃতিরই হউক তাহা কিয়ৎপরিমাণে স্বভাব-অনুকারী, তাহাও নিঃসন্দেহ। তবে প্রভেদ এই যে, কোনটী কুস্বভাব-অনুকারী, কোনটী সৎস্বভাব-অনুকারী। যে আদর্শে যে ফল এবং সে ফলের যে পরিণাম আদিকাল হইতে পৃথিবীতে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। অধিক বাক্য-ব্যয় অপ্রয়োজন।

যথেচ্ছাচারের যে পরিণাম, কে না জানেন ? সামান্য দেহীর দেহযষ্টি যথেচ্ছাচারে ধ্বংস হয়, রাজ্যরক্ষা ত দূরের কথা। যথেচ্ছাচারের সহযাত্রী অসন্তোষ,—অশান্তি,—সংক্ষোভ ও সংহার। প্রজা-তন্ত্রের পরিণামও প্রীতিকর নহে। প্রজাতন্ত্র ও যথেচ্ছাচার রাজ-তন্ত্র—উভয় প্রণালীই স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া চলিতে চায়। যে স্থলে স্বভাবের অতিক্রম, সেই স্থলেই অপ্রতুল। প্রজাতন্ত্র পাশ্চাত্যদিগের আবিষ্কার ; কাযেই তাহার জন্য তাঁহাদিগের অহঙ্কার। কিন্তু 'প্রজাতন্ত্র' তাঁহারা পরিপাক করিতে পারিতেছেন না।

আমরা উপরে যে আদর্শের আভাস দিয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ, অস্ফুট এবং আরও অধিক ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। কিন্তু সে ব্যাখার স্থল ও কাল ইহা নয়। তত্রাচ যে অল্প অল্প আভাস আমরা দিয়াছি তাহাতে প্রতীত হইবে যে, আমাদের আদর্শ—স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি যদি না হয়—অন্ততঃ তাহার অনেক নিকটবর্ত্তী। পরন্তু সে আদর্শ আমাদিগের হিন্দু সংস্কারের এবং শাস্ত্রের—পুরাবৃত্তের এবং প্রণালীর বহির্ভূতও নহে।

কিন্তু রাজ-নৈতিক আদর্শ লইয়া কেনই বা এত কথা ? আদর্শ লইয়া আমরা করিব কি ? আদর্শ কোথায় প্রয়োগ করিব ? কিসে প্রয়োগ করিব ? আমাদের আছে কি ? রাজা নাই, রাজ্য নাই, লক্ষ্য নাই, নীতি নাই ! কি আছে ? আছে কেবল গোলামি ! !

"গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী !" আরও গোলামী শিখুক। নফর নিষ্ঠীবনের অধিকারী। শাসন-নীতিতে তাহার অধিকার কি ? নীতি লইয়া সে কি করিবে ?

উপরি-উক্ত কথা—উত্তেজনার কথা, অবিবেচনার কথা। উহা আক্ষেপেরও কথা বটে। কিন্তু আক্ষেপ স্বভাবতই অতিরিক্তের দিকে যায়, অযুক্তির দিকে যায়। অতএব তাহা বিচার্য্য নয়।

অদৃষ্টচক্রের ঐশ্বরিক আবর্ত্তনে প্রাচ্যভূমি পাশ্চাত্যের করতলস্থ। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের অধিপতি। মনে কর, শেষোক্তই না হয় হইত প্রথমোক্তের অধিপতি। তাহাতে দূষনীয় কি ? পূর্ব্ব পশ্চিমের রাজা হইলে পশ্চিম পচিয়া যায় না। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব যদি পশ্চিমের প্রজা হয়, পূর্ব্বও তাহাতে পচিয়া যায় না। তুমি যদি আস্তিক হও, জগতের ইতিবৃত্তে অল্প পরিমাণেও অভিজ্ঞ হও, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের অনুশীলনশীল হও, শীতল মস্তিষ্কে চিন্তা করিতে সক্ষম হও, তোমার যদি সংসার-জ্ঞান থাকে, বিষয় বোধ থাকে, Common sense থাকে,—তুমি উপরোক্ত বন্দোবস্ত বা ভবিতব্যদ্বয়ের কোনটীতেই বিরক্ত বা ব্যথিত হইবে না। যদি উহাতে তোমার বিরক্তি বা বেদনা জন্মে, তবে বুঝিবে যে তাহা তোমার অস্বাভাবিক অহঙ্কার নিবন্ধন জন্মিতেছে। তদ্ব্যতীত তোমার বিরক্তি ও বেদনার কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।

এসিয়ায় ইয়ুরোপের আধিপত্য, ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আধিপত্য, মূলতও দূষনীয় হইতে পারে না। যদি উহাতে কোনও দোষ থাকে তাহা মূলে নয় ; দোষ—শাখাপ্রশাখায়, পত্রে পল্লবে। অতএব তাহাই বিবেচ্য।

রাজা,—আর্য্য, অনার্য্য, মুসলমান, ম্লেচ্ছ, ইংরেজ, ইহুদী,—যিনি হউন না, তিনি রাজা। তুমি যদি হিন্দু হও, রাজাকে রাজভক্তি রাজ-সম্মান তোমার দিতেই হইবে। তাহা যে তুমি শঙ্কা প্রযুক্ত দিবে, তাহা নয়। ধর্ম্মতঃ তাহা তোমার দেয়। পরন্তু বৈষয়িক হিসাবেই ধর আর যে হিসাবেই ধর, রাজার জাতি কুল বা জন্ম-কোষ্ঠী প্রজার প্রধান বিচার্য্য নহে। প্রজার প্রধান বিচার্য্য—রাজার রাজ্য-শাসন-নীতি, এবং সেই শাসনের শুভাশুভ। সন্নীতির অভাব হইলে স-গোত্রীয় রাজাও সর্ব্বনাশ করেন ; সুনীতিবান্ ভিন্নজাতীয় রাজাও সর্ব্বমঙ্গলালয় হয়েন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সন্নীতির প্রভাব ও অভাবই রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের কারণ। তাহাই প্রজার বিচার্য্য। রাজা এবং রাজপুরুষদিগেরও তাহাই বিচার্য্য।

আমাদিগের ইংরেজ রাজার রাজত্ব ক্রমে পুরাতন ও পরিপক্ক হইয়া আসিল। উহা আর আধুনিকও নহে, আমাদিগের অনভ্যস্তও নহে। উহার সুখ দুঃখ সুনীতি কুনীতির বিষয় আলোচনা করিতে আর আমরা অপারগ নহি। ইংরেজশাসনের মূলনীতি কি এবং সে নীতি কিরূপ গতি এবং প্রণালীতে ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে, সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহাদিগকে এ বিষয় বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। পরন্তু ইংরেজ-রাজত্বের সদাচার ও সৎকীর্ত্তির কথা এখনকার বিদ্যালয়ের বালকেরও কণ্ঠস্থ। অতএব সে কথা আর আমরা নূতন কি বলিব ? ইংরেজ-গবর্মেন্টের 'গলদ্ ও গফ্লতের' বিষয়ও

সংবাদপত্রের প্রতিদৈনিক পঞ্জিকায় গণিত, বিজ্ঞাপিত ও বিতর্কিত হইয়া থাকে; তাহাও আমাদিগের আলোচ্য নহে।

আমরা কেবল ইঙ্গিতে দেখিতে চাই আমাদিগের অঙ্কিত আদর্শনীতি অদ্যকার ভারত-সাম্রাজ্যে প্রযুক্ত ও অনুষ্ঠিত হইতে পারে কিনা,—হইতে পারার অন্ততঃ সম্ভাবনাও আছে কি না।

অসম্ভাবনা আমরা অনুভব করি না। কারণ ইংরাজের ভারতীয় রাজনীতি আমাদের আদর্শ হইতে অত্যন্ত দূরে হইলেও উহা তাহার বিরোধী নয়।

উক্ত রাজ-নীতি নিয়মতন্ত্র। ইহাই সৌভাগ্য। নিয়ম সর্ব্বতোভাবে সমুন্নত নয়, এবং শাসন-যন্ত্র-পরিচালনে কখনও কখনও নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটে, সে স্বতন্ত্র কথা। আমাদের শাসন-নীতির মূলে নিয়ম আছে, সর্ব্বত্রই নিয়ম আছে। যে স্থলে প্রজাপক্ষের পূর্ণ অভিমত গ্রহণ না করিয়া নিয়ম নির্দ্ধারিত ও বিধিবদ্ধ হয়, সে স্থলের নিয়ম "যথেচ্ছাচার"-প্রসূত বলিয়া কথিত। এ অর্থে আমাদিগের রাজনৈতিক নিয়মাদি রাজপুরুষদিগের যদৃচ্ছাসম্ভূত এবং ইংরাজ-শাসন যদৃচ্ছা-তন্ত্র। অথবা যদৃচ্ছা-নিয়ম-তন্ত্র।

বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না যে, এই যদৃচ্ছা-তন্ত্র-প্রণালী নিরো, ক্যালিগুলা বা সিরাজ-উদ্দৌলার যথেচ্ছাচার নহে। এ যদৃচ্ছা-তন্ত্রের অভ্যন্তরে এবং অন্তরালে প্রজার সুখদুঃখানুভূতির প্রতি সরস সহানুভূতি আছে; প্রজাপালনের প্রচুর প্রয়াস আছে। রাজকীয় যদৃচ্ছাচারের অনবরত-উড্ডীয়মান রক্ত-পতাকায় লেখা—"প্রজা-পালন"।

এ প্রকার নিয়ম-তান্ত্রিক যদৃচ্ছা-তন্ত্রের প্রজা-পালন-মুলক শাসনে আমরা যে একেবারেই অনভ্যস্ত তাহা নহি। প্রত্যুত আবহমানকাল হইতে অভ্যস্ত। যে তন্ত্রই হউক, যদি তাহার মূলমন্ত্র হয়—'সুশাসন ও প্রজাপালন', আমরা নামের জন্য আপত্তি করি না। ফল কথা—ইংরাজের শাসনে আমরা অসন্তুষ্ট নহি, সন্তুষ্টই আছি। ইংরাজ সুশাসন করিতে না পারিলেও সুশাসনের চেষ্টা করিয়াছেন। সুশাসনের চেষ্টা করিয়াও সুশাসন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, প্রজা-শক্তির অসংস্থান ও প্রজাশক্তির সহিত রাজ-শক্তির সম্যক সংমিশ্রনের অভাব। ইংরাজশাসনে প্রজা-শক্তি সঞ্চিত হয় নাই, রাজশক্তি তাহার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কার্য্য করে নাই; সুতরাং সাম্রাজ্যশরীর—সম্যকরূপে শোণিতসঞ্চালনের অভাবে সুগঠিত হয় নাই।

কিন্তু সাম্রাজ্যশরীর সুগঠিত করিতে ও তাহার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে আমাদের রাজা বা রাজনীতি যে একেবারেই উদাসীন ও অনুৎসুক, তাহা নয়। যে নীতির মূলে প্রজা-পালন ও প্রজা-পুষ্টি-সাধনের সংকল্প আছে, তাহা প্রজাশক্তির প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা করিতে পারেন না। প্রজা-পালনের জন্য প্রজা-সাধারণের অভিমত গ্রহণ করাও এ প্রণালীর অনভিমত নহে। ভারতীয় রাজকার্য্যে প্রজা-পুঞ্জের ইচ্ছা-অভিপ্রায় গ্রহণ করার নিয়ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে না থাকিলেও কিয়ৎপরিমাণেও আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সে নিয়ম সর্ব্বদা যে সুপালিত হয় না, সে কেবল অন্ত্রযন্ত্রের দোষে। অন্ত্রযন্ত্র সুগঠনপ্রাপ্ত হইলে সে দোষ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। রাজকার্য্যে প্রজাসাধারণের ইচ্ছা অভিপ্রায় গ্রহণ করার রীতি—অন্ততঃ সে রীতির ঈষদ্ অঙ্কুর আমাদের রাজশাসননীতিতে আছে। অঙ্কুর সুরক্ষিত ও সুপালিত হইলে মহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াই থাকে।

প্রজা-শক্তি সঞ্চয় ও সংরক্ষণার্থে ফিরিঙ্গি-রাজ যে একেবারেই অবহেলা করিয়াছেন তাহাও নহে। মুখ্যভাবে না হউক, গৌণভাবে সে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা রাজা বিলক্ষণরূপেই করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইয়ুরোপ বলেন ও বুঝেন,—"Knowledge is power।" আমাদিগের ভূস্বামী, সাধারণ-শিক্ষা-বিস্তারে জ্ঞান-শক্তি-সংগ্রহের সদুপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব প্রজা-শক্তির প্রতি রাজশক্তি এস্থলে একান্ত উদাসীন নহেন। প্রজাশক্তি-প্রস্তুতের পথ যখন পরিষ্কার ও প্রশস্ত করা আছে, তখন সে শক্তি সম্যক্‌রূপে কার্য্যোপযোগী হইলে রাজশক্তি নিশ্চয়ই তাহা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং উভয় শক্তির স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর সংমিলনে সাম্রাজ্য শরীর সমুন্নত হইবে, এরূপ আশা করা আকাশকুসুম চয়ন করা নহে।

বক্ষ্যমান শাসননীতির ইহাও একটী সুলক্ষণ যে, ইহা ক্ষুদ্রতম হইতেও ক্ষুদ্রতর প্রজার অভাব-আকাঙ্ক্ষা-অনুসন্ধানে প্রয়াসী—এবং তাহার স্বার্থ ও স্বত্ব সুরক্ষণে সমুৎসুক। আমীরের ন্যায় ফকিরের প্রতিও ইহার দৃষ্টি আছে; ফকির আমীর কর্ত্তৃক ধ্বংস না হয় তৎপক্ষে সুবিধির ব্যবস্থা আছে। প্রজাশক্তি প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে এটী যথার্থই বড় সুলক্ষণ।

স্বীকার করি, ইংরাজের শাসননীতি ‘শীতলোষ্ণ’ বা ‘কোমল-উগ্র’। তবে সেটা যে কেবল সিকিপয়সার স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য, এ কথা স্বীকার করি না। স্বীকারই না হয় করিলাম। তাহাতেই বা কি? উষ্ণতা ও উগ্রতা শৃঙ্খলাসংস্থাপন ও সংরক্ষণার্থে অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য অধিক উৎকণ্ঠার কারণ নাই। এ উষ্ণতা ও উগ্রতা ইংরাজশাসন অনেক সময়ে আপন জন্মভূমিতেও প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং এখনও আবশ্যকমতে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইংরাজ বলিয়া কেন, সাম্রাজ্য-শাসয়িতা জাতিমাত্রেই উহা আছে,—থাকা অনিবার্য্য। তাহাতে মূল, নীতির বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না। অতএব সাময়িক উগ্রতায় অধিক আশঙ্কা নাই। পরন্তু শীতলতা ও কোমলতা ক্রমে সুস্নিগ্ধ মধুরতায় পরিণত হইবারই ত কথা।

অতএব ইংরাজশাসন আমাদের আদর্শের বিরোধী নহে। উহাতে ইহার বীজ নিহিত আছে। এরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষের বীজ বিলম্বেই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু বিকাশপথে প্রতিদিনই অগ্রসর হয়। কল্য অপেক্ষা অদ্য বিস্তর অগ্রসর হইয়াছে, আগামী কল্য আরও হইবে।

ভারতে প্রজা-শক্তি ও প্রজানীতি প্রস্তুত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা এই কঙ্গ্রেস। প্রজা আপনা হইতেই এ পরীক্ষা দিতেছেন। রাজা যদি এ পরীক্ষায় প্রীতি ও পরিতোষ লাভ করেন, প্রজাশক্তি ও প্রজানীতির পরিচয় পান, অবশ্যই তিনি তাহা নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করিবেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রজা নিশ্চয়ই রাজ-প্রসাদ লাভ করিবেন।

বলা অতিরিক্ত, এ পরীক্ষা বড়ই কঠিন পরীক্ষা—প্রকাণ্ড প্রবল পরীক্ষা। এ পরীক্ষা বিঘ্নবিপদবেষ্টিত, কাঠিন্য ও কণ্টকময়! তা হওয়াই স্বাভাবিক। "ছাত্রবৃত্তি" হইতে উচ্চতম “আর্ট” পরীক্ষামাত্রই কঠিন ক্লেশকর ও বিঘ্নবিপত্তিসঙ্কুল। সামান্য পরীক্ষা যখন তদ্বৎ; তখন এত বড় অসামান্য পরীক্ষা— যাহাতে মহাভারতীয় প্রজাপুঞ্জের, সংখ্যাতীত বিবিধবর্ণসম্ভূত নানাভাষাসমন্বিত সহস্রাধিক বিভিন্ন ও বিরোধিস্বার্থ বিজড়িত মনুষ্যপ্রকৃতির একত্রীভূত একস্বরতানলয়মিশ্রিত প্রজানীতির পরিচয় দিতে হইবে, তাহা কতই কঠিন! চতুর্দ্দিগে বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে কূটাদপি কূটপ্রশ্নের সমষ্টি! পরীক্ষার প্রহরীদিগের মার্ত্তণ্ডমূর্ত্তি ভ্রূকুটিকুটিল কুপিতনেত্র, কোপকষায়িত ভঙ্গিমা, রক্তাধরে স্ফুট ও অস্ফুট ভীমগর্জ্জন! * * * * * তা এরূপ না হইলে পরীক্ষার্থীর শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে কিসে!

কঙ্গ্রেস আর কিছুই নয়;—প্রজানীতির এক প্রকাণ্ড পরীক্ষা সভা। দুই দশ জন রাজপুরুষে ও এক আধ জন কাপুরুষে যাহাই বলুন,—এ সভা সম্পূর্ণরূপে ভারতসাম্রাজ্যের শাসননীতিসম্ভূত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় যে প্রজা-শক্তি ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল, কঙ্গ্রেসে তাহার সমষ্টি। ভারতবাসী প্রত্যেক প্রাণী—এক দুই তিন করিয়া গণিয়া সমগ্র ভারতরাজ্য—কঙ্গ্রেসে মিলিত হইয়াছে ইহা আমরা বলি না। কিন্তু সমষ্টিভাবে সমস্ত ভারতবাসী ইহাতে আছেন, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, মগধ, মিথিলা, মান্দ্রাজ, মধ্যদেশ, বোম্বাই, পঞ্জাব কঙ্গ্রেসে প্রজাস্থয় পরীক্ষায় উপস্থিত ও একত্রিত! এরূপ দৃশ্য ভারত বহুকাল দেখেন নাই! জগতে বহুকাল হইতে উদয় হয় নাই! ধন্য সাম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া!

কঙ্গ্রেসে অধিনেতৃদিগের দোষ ত্রুটী অনাবধানতা অসাবধানতা, অধৈর্য্য চপলতা বিলক্ষণ আছে তাহা আমরা জানি, দেখিতেছি। সে সব একে একে এস্থলে উল্লেখ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ—অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সে সকল বারান্তরে আলোচনা করিয়া আমাদিগের যে পরামর্শ প্রকাশ করিব।

কিন্তু কঙ্গ্রেস কি চাহেন? কঙ্গ্রেস চাহেন প্রজানীতির পরীক্ষা দিতে আর চাহেন ভারতীয় শাসন প্রণালীতে যাহা আছে—তাহাই কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিতে। অভিনব ও অতিরিক্ত অধিকার তাঁহারা কিছুই চাহেন না। রাজপুরুষদিগকে বনে বা বাণপ্রস্থে প্রেরণ করা কঙ্গ্রেসের অভিপ্রায় নহে। অতএব তাঁহারা শঙ্কিত হইবেন না। তাঁহাদের পার্শ্ব-চর ও উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন-ভোজীদিগেরও শঙ্কার কারণ নাই।

(ক) পুলীশ বিভাগের সংস্কার ষোল আনা আবশ্যক, ইহা কঙ্গ্রেসের কর্কশ সমালোচক লর্ড ডফরীণ তাঁহার তীব্র ভ্রূ-কুঞ্চন ও তীক্ষ্ণ নাসিকা উত্তোলনের মধ্যেও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া কঙ্গ্রেস বোধ করি বিশেষ কিছু অকার্য্য করেন নাই। পুলীশ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার একটু কমিলে ও কার্য্যকারিতা একটু বাড়িলে দেশটার হাড় জুড়াইবে ইহাও বোধ করি নিসন্দেহ।

(খ) অস্ত্র-আইনে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে—ইহা কি মিথ্যা? কঙ্গ্রেস কি ইহা আজ নূতন বলিতেছেন? না, পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য হাহাকার হইতেছিল।

(গ) ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন। ইহাতেই বা দূষণীয় কি? ইহাও ত রাজার শাসননীতির বিরোধী নয় এবং সে নীতির অতীত একটা নূতনতর ব্যাপারও নয়। দেশীয় সভ্য কি ব্যর্বস্থাপক সভায় নাই? চক্ষু মেলিয়া উত্তর প্রদান করুন? দেশীয় সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত এবং গৃহীত হইয়াই থাকেন। তবে যে রীতিতে নির্ব্বাচন গ্রহণ করা হয় এবং যে পরিমাণে দেশীয় সভ্য গ্রহণ করা হয়, তাহাতে যে অভিপ্রায়ে দেশীয় সভ্য গ্রহণ, তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই কারণ কঙ্গ্রেস বলেন, ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন হউক। উদ্দেশ্যটী তোমার উত্তম, কিন্তু যে উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাও তাহা অকিঞ্চিৎকর, কেন না সে উপায় পৌনপণিক পরীক্ষিত করিয়াও তাহার কার্য্যকারিতা সিদ্ধ হয় নাই। এখন তোমারই উপায়টী একটু ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কার্য্যকর করিয়া তোমারই অনুষ্ঠিত উদ্দেশ্যটী যদি সাধন করিতে বলা যায়, তাহাতে যে কেন তোমার আপত্ত হইবে, ইহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমারই পাঁটা তোমারই ছুরিতে কাট, কেবল বলি এই যে ছুরিটীতে একটু ধার করিয়া লও। ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া গড়ার স্থূল তাৎপর্য্য এই; প্রথম এবং শেষ, ‘লম্বাই ও চওড়াই’ এই। তা ইহাকে “পার্লামেণ্টই” বল, “সেল্ফ গবর্মেণ্টই” বল আর “হোমরুলই” বল যা খুসী তাই বলিতে পার। বিষয়টা কিন্তু বেশী কিছু নয়। অতএব ইহার জন্য অত্যুচ্চ পদস্থ সমালোচক মহাশয় কুপিত হইয়াছিলেন কেন আমরা বুঝিলাম না। কিন্তু কোপের কথা যাউক। কাযের কথাই আমাদিগের আলোচ্য।

প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব ও আকাঙ্খা ও অভিপ্রায় অভিব্যক্তির জন্য ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সভ্য গ্রহণের রীতি। এ রীতি ইংরাজ শাসনেরই নিজস্ব নীতি। আমরাও চাহিতেছি তাই। বর্ত্তমান প্রথায় ও আমাদের প্রার্থনায় প্রভেদ যদি কিছু থাকে তাহা দেশীয় সভ্য গ্রহণের পরিমাণে ও প্রকৃতিতে। তা সেটা বড় বেশি কথা নয়। তাহাতে রাজপুরুষদিগের বনে গমন করিতে হইবে না; প্রজাও রাজতক্তে বসিবে না।

আয়র্লণ্ড কি চায় এবং কি পায় না, তাহা অনুসন্ধান ও আলোচনা করার প্রয়োজন আমাদের নাই। আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা অতি সামান্য। অতএব কহিব না তাহার কোন কারণ নাই। সে কালের রাজারা প্রজার আকাঙ্খা ও অভিপ্রায় গোপনে অনুসন্ধান করিয়া তাহার পূরণ ও প্রতিবিধান করিতেন। কাযেই সমবেত সভা করিয়া কিছু জানাইতে হইত না। কিন্তু কাল ভেদে লক্ষণ ভেদ। বর্ত্তমানকালে বর্ত্তমান প্রথাই অনুষ্ঠেয়। ইংরেজের নিকট ইংরেজী ধরণেই যাইতে হয় ও জানাইতে হয়। সুতরাং কঙ্গ্রেস, কনফারেন্স প্রভৃতি প্রজা-সভার উৎপত্তি।

লর্ড ডফরিণ বলিয়া গেলেন “কঙ্গ্রেস যাহা অগ্রসর করিতে চাহিতেছেন, তাহা অগ্রসর করিতে পরিপক্ক বুদ্ধি দূরদর্শী দেশীয় রাজ-নৈতিকদিগের মধ্যে কেহই কখনও তাঁহার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। অতএব প্রজার সে অধিকার অগ্রসর করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।”*

বেশ কথা। এ কথা আমাদিগেরই সপক্ষ কথা। এ কথা—কঙ্গ্রেসের বিপক্ষ কথা নহে। মানিয়াই লইলাম কঙ্গ্রেসে পরিপক্ক বুদ্ধি আক্কেলমত সমজদার রাজ-নীতিবিৎ নাই। তাহাই না হয় হইল। কিন্তু পাকা রাজ-নৈতিক যখন বলিবেন “উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে” তখন ত আর সংশয়ের কোন কারণ থাকিবে না। যে সময় এখন আসে নাই বলিতেছ তাহা একদিন না একদিন ত আসিবেই। কঙ্গ্রেস না হয় কথাটা একটু অগ্রেই উপস্থিত করিয়াছেন। অতএব কঙ্গ্রেসের বিশেষ কসুর কি?

গৃহ-গত প্রতিনিধি মহাশয় আক্ষেপ করিয়া গেলেন,—যে ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া কঙ্গ্রেস যদি ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক প্রশ্ন মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া দারুণ দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্মেণ্টকে পরামর্শ দিতেন বা পল্লিবাসী জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিধানের আয়োজন করিতেন তাহা হইলে অধিকতর মঙ্গল সাধনের সম্ভাবনা হইত এবং তাহা হইলে কঙ্গ্রেস তাঁহার

---

* সেণ্ট এণ্ড্রুজ-ভোজন-সভার বক্তৃতা।

সহানুভূতির পাত্র হইত। এ আক্ষেপে বা উপদেশে আমরা উপকৃত। কিন্তু সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ শব্দ যোজনা মূহুর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যদি তিনি উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যের জন্য আন্তরিক ভাবে কংগ্রেসকে আহ্বান করিতেন তাহা হইলে বোধ করি, তাঁহার পদোচিত হইত। তাঁহার সুযোগ্য সমুন্নত উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি মহাশয় উপরোক্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার জন্য কংগ্রেসকে একবার আহ্বান করুন দেখি, কংগ্রেস কৃতজ্ঞচিত্তে এখনি তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। যদি না করেন বা করিতে না পারেন, কংগ্রেস যথার্থই একটা কৃত্রিম কাণ্ড। রাজ-শক্তির সহায়তা করিবার জন্যইত কংগ্রেস।

প্রজা-শক্তির সমষ্টি ও সংগ্রহ করিতে রাজ-শক্তি শঙ্কিত কেন? শঙ্কা নিশ্চয়ই দুর্ব্বলতা জনিত। দুর্ব্বলতা অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। এ স্বাস্থ্যহীনতায় স্বাভাবিক কারণ কি আমরা অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রজা-শক্তির সহিত রাজ-শক্তির —স্বাভাবিক সংমিশ্রন হউক সাম্রাজ্য শরীর এখনি সমধিক সবল হইয়া উঠিবে। শঙ্কা সন্দেহ সংশয় দূরে পলায়ন করিবে আর কখনও নিকটে আসিবে না।

মালিনী।*

(১)

বলে ফুল দুলে দুলে,—আদর আমার গেল কোথায়?
বয়স ভাবুক—বয়স গেছে, প্রাণের তাতে কি আসে যায়?
বনের মাঝে পড়ে থাকি;
কথা কেন কওনা ডাকি?
কেউ কিছু কি বোলবে নাকি?—তবে কেন পুষলে আমায়?
আপনি হাসি আপনি খসি,
কভু মলয় কোলে ভাসি।
আগে কেন ভালবাসি এখন আমায় দিচ্ছ বিদায়?

আমায় লোকে বলে—"তোর বিদ্যে নেই, তবু এত বাড়াবাড়ি কেন?" আহা! লোকের কথা কি মিষ্টি! তবে বলে ঠিক। বিদ্যাহীনের আবার এত কেন? সুধু কি তাই গা? আমার বিদ্যেও নেই, বোনপোও নেই! তাতে আবার আমার বয়সটা কিছু বেশী বেশী দেখায়! লোকের ত বলবার সময়ই এই! দুঃখ হয়,—যখন বয়স ছিল, তখন কেউ এগুতে পারেননি! তখন আমার বিদ্যে ছিল—কাজেই অন্যে বড় ঘেঁশ দিত না। পোড়া বয়সের কি বেয়াড়বী! আগে শুনতাম—বয়স হ'লে লোক পাকে, তখন তার কদর হয়।—এখন দেখচি; বয়স হ'লে পাকে সত্য; কিন্তু পাকলেই পড়ে। পড়ে

---

* রাম না জন্মিতেই রামায়ণ! 'মালঞ্চ' মাথা না তুলিতেই 'মালিনী' উপস্থিত! প্রতিজ্ঞা না করিতেই আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ! তা কি করিব বলুন? ভবিতব্য—ভাবনার অতীত। 'মালঞ্চের' প্রথম ডালাতেই মালিনী-হস্ত-রঞ্জিত মালা আমরা পাইব—ইহা যথার্থই জানিতাম না। যাহাই হউক, যখন হাটের মাঝে ফুলের পসরা খুলিয়া বসিতে হইল, তখন মালিনীর মালায় আমরা হেলা করিতে পারি না;—তা সে মালা মল্লিকারই হউক, আর মোরোগ ফুলেরই হউক। মালিনীর মালা অবহেলা করিতে সাহসী নই, কিন্তু মালিনীকে বড় ভয় করি। বিশেষতঃ ইনি যে-সে মালিনী নহেন—"হীরে" মালিনী। তবে ইহাঁর "বিদ্যাও নাই, বোনপোও নাই"। তা, এই টুকুই আমাদের ভরসা। মালঞ্চ-সম্পাদক।

তাতে দুঃখ নাই ; কিন্তু একে একে পড়ে কেন ? দাঁতগুলো পড়্‌বার আগে যেন সমস্ত শরীরটে পড়াই ভাল বলে বোধ হয়।

আচ্ছা, আমার না হয় একটু বয়সই হয়েছে ; কিন্তু প্রাণের তাতে কি ? কোটা বাড়িটেই যেন ঝড়বৃষ্টিতে বিবর্ণ হয়েছে—এখানে ওখানে চুণ সুরকী খসেছে ; তা ব’লে কি ঘরের মধ্যে ক্যাশ-বাক্সয় যে হীরের আংটীটি আছে—সেটিকেও মেরামত করাতে হবে ?

আর সে বোনপোও নেই, সে বিদ্যেও নেই যে, হীরে চিন্‌বে। চিন্‌বেই বা কি ক’রে ? সকলে ত আর হীরে দেখেনি, হীরের ব্যবহারও করে নি। আগে অনেকের মাথায় বেড়িয়েছি, কেউ বা গলায় রা’খতো ; অনেকের হাতেই থাকতুম। তবে আজ কেন বন-জঙ্গলে পড়ে আপনা আপনি মাটী হই ? কারুর নজরে পোড়লে আজও ভরসা আছে ;—তিলকাঞ্চণটা হইবেই হবে !

তাই ভাব্‌চি, একবার পুরোনো বাগানটা নতুন ক’রে ঝালিয়ে নি। ভাল ভাল গাছগুলি ত অকালে মারা গিয়েছে। যা আছে, তা বুড়ো। তাদের ফুল হোমেই লাগে ; মন ভোলে না। এখন গোলাপের সঙ্গেই আলাপ বেশী ; কারণ,—সাহেবেরা গোলাপের গোলাম !

এ বয়সে নূতন চারায় ফুল ফুটিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করা, আর ভীম-একাদশীর পর একখানি বাতাশা খেয়ে সন্তুষ্টমনে চাল কাঁড়া—এ দুইই সমান। তাও পারি, যদি সকলে একটু যত্ন করে—একটু টান দেখায়। দেখাবেন না কেন ? একটানেই জলিয়ে দিতেও পারেন, ভূমিসাৎ ক’রতেও পারেন ! সুতরাং আমি গলবস্ত্রে বলি—আমার সে সহানুভূতিতে কাজ নাই।

বাঙ্গালী পরের জিনিস বড় ভাল বাসে। একজনের একটি সামগ্রী দশজনে ব্যবহার করে। কাহারও একটি ভাল ফুল ব্যবহার করবার যো নাই ! অমনি দশজনে সেটিকে কাড়াকাড়ি ক’রে ছিঁড়বে ;—কেহই তৃপ্তি-লাভ কোরবে না ! পাড়ায় একটি নূতন জিনিস দিলে দশ জনের সেই-টিতে নজর, অথচ মালিনীর কাছে চাইবে না। ভাবে,—বুঝি বোনপোকে যেমন যত্ন করিতাম তেমন আর কাহারো প্রতি কোরবো না। হায় ! বিদ্যে থাকলে জানতে,—আমার ভালবাসা সর্ব্বভূতেই সমান !

বাগানে হাত দেবো বটে, কিন্তু দেবতারা না চটেন। করবী, ধুতুরা, বকে,—আর আমার ইচ্ছা নাই। যন্ত্র-পুষ্প থাকায় অনেক জ্বালা। প্রাচীণেরা প্রভাতে সাজি হাতে করে এসে দুচোকোত্রত ডাল ভাঙবেন, আর একটু

কোথাও সাজান-গোছান দেখ্‌লে অমনি বোলবেন—“সব গেলো, কালে কালে সব গেল” ! আবার ফেরবার সময় এত যত্নের ভুঁই-চাঁপাটি মাড়িয়ে গেলেন—একবার চেয়েও দেখলেন না যে তাতে কি আছে ! তার জন্য জল তুলে মালির মাথা ঘুরে গেছে। অথচ পদদলনেই তার সমালোচনা হয়ে গেল। তাই বলি—যন্ত্র-পুষ্প আর রাখবোনা, আর হংসমধ্যে বকের আবশ্যক নাই।

বড় সুখের বিষয় যে, দেবতাতে আর ঠাকুরে বিলক্ষণ তফাৎ আছে। ঠাকুরেরা মালঞ্চের ফুলই ভাল বাসেন ;—অন্ততঃ আগে ত বাস্‌তেন, এই পর্য্যন্ত জানি। তাঁদের কাছে ধোয়া ধোয়া, কচি কচি, সাদা সাদা, ছোট ছোট, রজনীগন্ধারই আদর বেশী। সব সুখ সকলের অদৃষ্টে ঘটে না ; তাই বোধ হয়, সূর্য্যমুখীকে চিনিলেন না !

একটা আমার বড় নতুন ঠেকবে ; এখন ছাঁ-পোশা আর কেউ চায় না ; কলমের চারারই আদর বেশী ! কিন্তু ধার না করিলে সেটি হবার যো নাই। এটি আগে ছিল না। নিজের বাগানে যা হচ্ছিল, লোকে তাহাই সোণা হেন মুখে গ্রহণ কোরতো। এখন পরের বাগান না হলে আর একদণ্ড চলে না ! ‘উধারে’ যোজনগন্ধা ফুটাইলে আর কি হবে ? হবে এই যে, অন্যের বেগুণ-ফুলটির কাছেও শেষে স্থান পাবে না !

মালঞ্চের মালিরা প্রায়ই সব বাঙালী। মালিনী—সুন্দরের মাসি ; ফুলগুলি দিশি। গন্ধ আছে, মধুও আছে,—সুতরাং কি দেখে এর আদর হবে ? বিলাতী মালঞ্চে দেশ ভরা। ফুলগুলি ভাল হলেও কাটমল্লিকে। কিন্তু তার আদর না কোর্‌লে সমাজে খাতির থাকে না। এ মালঞ্চে কেউ একটু জর্ডনের জল এনে দেবে কি ? আগে থেকে পাকস্পর্শটা হয়ে থাকাই ভাল !

সেই যে বলে——“উড়ে এক জন্তু”, তা বড় মিছে নয়। ঐ দেখনা, তেতে পুড়ে উৎকল-তিলক এই দিকেই আস্‌চেন। বিক্রম কত ? চুরোট খেয়েই প্রাণ-ধারণ করেন ! গরীবের আবার এ রোগ কেন ? বাবুরা খান, শোভা পায় ! এ মালিটীর স্বজাতির উপর সহানুভূতিটা কিছু বেজায় ;—তাই কপির চাষে বিলক্ষণ মনোযোগ। কিসে কপিরে ঠাণ্ডায় থাকে, কিসে তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়,—সর্ব্বদাই এই চেষ্টা। দিবারাত্র তাদেরই গোড়ায় জল দিয়া

থাকেন। আমারই তাতে প্রাণ যায়। বাঁধা কপিকে পার আছে ;—কিন্তু ফুলের জ্বালায় অস্থির হয়েছি। তাঁর আবার মনে মনে ধারণা—আমি ওঁর রূপে বশীভূত! বাহাদুরী করে বলা হয়,—"আমাদের মত মালি কে হ'তে পারবে? আমাদের মাথাতেই কেয়ারির পরিচয়!" কথাটা বোধ হয় সঙ্গত ; কারণ,—"Charity begins at home"!

এই যে সামনেই—

মালি। তেন্তে ভাল বাসুকি মোর প্রাঁড় বাহিরিলা।

"আহা এমনই কোমল প্রাণই বটে!"

মালি। বাবু পাঁই এন্তেকি মরচু কাঁই?

"বাবুদের জন্যে ভাব'ব না ত কি তোমার জন্য ভাবতে হবে? বাবুরাই হলেন দেবতা, ওঁরাই আমাদের রেখেচেন"। বাবুরা যেন ঐ অস্তর কথা শুনে রাগ না করেন। আমাকে অনেক ভূত নিয়ে থাকতে হয়। ঐরূপ অনেক মূর্ত্তি মালঞ্চে জল দিতে এসে—গাছপালাগুলিতে জল দিয়ে গেছে। দেখি, ঠেকে শিখে কোন ফল হোলো কি না! অলির ঝঙ্কারে স্থির হ'তে পাই না—দেখি শুনিই বা কখন! ঝাঁকের ত বিরাম নাই। কিন্তু কেবল স্বার্থ! দেখ্‌চি, যে কার্য্যে লেডি নেই সেই, কার্য্যই অচল ; তাই এ বয়সেও আবার মালঞ্চে দেখা দিতে হোলো। দুঃখু,—বোনপো নেই! তা বোনপো কি আর পাবনা,—কিন্তু এবার বিদ্যেশূন্য!

আজ কেবল মালঞ্চের আগোড় খুললাম। ক্রমে বাগানের মধ্যে দেখা হবে। এই বেলা বলে যাই,—আমি শুধু মালিনী নই—"মালিনী-মাসী"; কারণ এখন ক্রমশঃ মালির সংখ্যা বাড়তে চোল্‌লো!

হীরে।

তৃণ-গুচ্ছ।

তৃণ বড় লঘু, তাহে শুষ্ক। তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ আর কি আছে? তবে তৃণ তুলিব কেন, তুচ্ছ তৃণের গুচ্ছ গাঁথিয়া বৃথায় জীবন গোঁয়াইব কেন?

⁂

তণ্ডুল সংগ্রহ করা ত সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সে শক্তিও ত সকলের থাকে না। সংসারে কেহ সংগ্রহ করেন—তণ্ডুল, কেহ করে তৃণ।

* *

তৃণ লঘু, শুষ্ক তুচ্ছ। তবুও মানব আমি তৃণেরও ত সমতুল্য নই। তৃণ অপেক্ষা যে আমি অনেক লঘু, বিষম শুষ্ক দারুণ দুর্ব্বল। আমি তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, তবুও হায় তম-ময়!!

⁂

ক্ষুদ্র তৃণ, শুষ্ক ও সামান্য তৃণ লঘু ও তুচ্ছ তৃণ একত্র হইয়া সংসারে শত সহস্রের আচ্ছাদন ;—শীত আতপ বায়ুবারিতে নিজে পতিত ও গলিত হইয়া শীত আতপ বায়ুবারি হইতে অসংখ্য প্রাণীকে রক্ষা করে, আপন অন্তরালে আশ্রয় দেয়। আর আমি?—আমি অন্যকে আশ্রয় দিব কি,—নিজেই নেহাত নিরাশ্রয়। অন্যের আশ্রয়, উপলক্ষ ও অবলম্বন নহিলে আমি অর্দ্ধ মুহূর্ত্তও টিঁকিতে পারি না ; কিন্তু, হায়! অহঙ্কারে ফাটিয়া মরি!!

* * *

কিসের অহঙ্কার,—অহঙ্কার দুর্ব্বলতার নিরাশ্রয়তার, অহঙ্কার লঘুতার ও ভিরুতার, শুষ্কতার ও স্বার্থপরতার, অহঙ্কার ক্ষুদ্রতার ও নীচতার। এ অহঙ্কার আমারই উপযুক্ত বটে!!

⁂

তৃণ তুচ্ছ হইলেও আমি,—আমার মত অনেকেই তাহার তুল্য নাই। তুচ্ছ তৃণ আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তৃণ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে পারাও আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য। কিন্তু তাই বা পারি কই!

* *

সংসারের তৃণ-গুচ্ছ গুছাইয়া দিতে পারিলেও কৃতার্থ হইলাম। একটী তৃণের মতও যদি পৃথিবীর কাজে আসিতাম, জীবন সার্থক হইত। যে জীবন হু'টী তৃণ সংগ্রহেও সক্ষম নয়, একটী তৃণের মতও যাহা জগতের উপকারে আসে না, সে জীবন লইয়া করিব কি! এ জীবনের যিনি অধিপতি স্রষ্টা ও নির্ম্মাতা, এ জীবন যে অনন্ত জীবনের অংশ, প্রতিবিম্ব বা পরমাণু, সেই জীবনের জীবন, জীবনপতির নিকট যাইয়া কি জবাব দিব!!

* * *

তৃণ তুমি তুচ্ছ নও; তণ্ডুল তোমারই রূপান্তর। তুমি নিম্নতমেরও নিম্নে পতিত থাকিয়া, উচ্চতমের অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছ। তুমি বিশ্বসংসারে বিনয়ের অবতার তাই উচ্চস্থানের অধিকারী হইয়া, উচ্চস্থানে উঠিবার শক্তি ধরিয়াও তুমি সকলের নিম্নে। তুমি বুঝাইয়া দিতেছ বিনয় কি বিজ্ঞতা কি! কিন্তু বুঝি কই! বুঝিলে কি আর এত বড়াই করিতাম!!

* * *

শক্তি নাই, সামর্থ নাই, স্বার্থপরতা যদৃচ্ছাকে সংকীর্ণ করে, সংহার করে। করি কি!!! তবুও দেখি যদি পারি। পারিব কি? না, পারিব না। স্তরে স্তরে যে তৃণ সঞ্চয়ে, সংসারের অপরিসীম উন্নতি, যে তৃণ সমষ্টিতে সাহিত্যের সম্পদ ও শ্রী,—তাহা সৃজনের শক্তি ত আমাদের একেবারেই নাই,—তাহা অন্বেষণ ও আহরণ করিয়া আনিয়া দিতেও আমরা অপারগ। তবুও দেখি যদি পারি,—যদি এমনতর এক আধটী তৃণও কুড়াইয়া অনিয়া দিতে পারি যাতে মহাশয়ের "খড়িকাকাটি'" হয়, বা মহাশয়ার "খ্যাঁওরাকাটি'' হয়। সাহিত্য সমাজে "খড়িকাকাটি" ও "খাঁওরাকাটি" যোগাইতে পারিলেও আমরা চরিতার্থ হইব।

কবিত্বে ও বিজ্ঞানে বিরোধ কি যথার্থই? কবিত্বে ও বিজ্ঞানে বিরোধ, ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে বিরোধ,—বিজ্ঞান কি তবে বিরোধেরই জন্য, বিজ্ঞানের উন্নতিতে কি তবে বিরোধেরই বৃদ্ধি হইবে? জানি না, এ বিরোধের তাৎপর্য্য কি; ইহার মূল কোথায়! বিজ্ঞান যদি সত্য সত্যই বিরোধ বিসম্বাদ বাড়াইতে চায়, নূতন বিরোধ সৃষ্টি করে; বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে না, বোধ করি ইষ্টই হইবে।

* * *

কিন্তু বিরোধের ত বিশেষ কারণ দেখি না, উদাহরণ ও অধিক নয়। যে কারণ ও উদাহরণ এ বিরোধের দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই, ব্যক্তিগত, বস্তুত বিজ্ঞানগত নয়। আর সে ব্যক্তিগত বিরোধ মীমাংসার অতীতও নয়। বৈজ্ঞানিক মাত্রেই যে শুষ্ক-হৃদয়, কল্পনা কবিত্ব ও কোমলত্ব বিহীন তাহাও নয়। যদি কচিৎ কোন কোন স্থলে তাহাও হয়—সেটী নিয়মের ব্যভিচার মাত্র, নিয়ম নহে। যিনি শুষ্ক তিনি স্বভাবতই শুষ্ক, বা শিক্ষা শঙ্কটে শুষ্ক, বিজ্ঞান জনিত শুষ্ক নহেন।

* * *

বিজ্ঞানকে কবিত্ব হইতে বঞ্চিত কর কেন? বিজ্ঞানের মূলে কি কল্পনা নাই? বিজ্ঞানের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা-ধমনী প্রথম কল্পে কল্পনায় গঠিত নয় কি? বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গ শরীরে শাখায় প্রশাখায় কোথায় কল্পনা নাই? বৈজ্ঞানিক বলুন দেখি যে 'নাই'! বিজ্ঞানকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাও দেখি যে তাহার শরীরে কল্পনা নাই, কবিত্ব ও কোমলতা নাই? তোমার 'উপপাদ্য' ও 'সম্পাদ্য' 'প্রতিজ্ঞা' মাত্রেই যে কল্পনা মূলক। তাই বলিয়া কি অসত্য?

* * *

কোমল পদার্থ অসত্য নয়, কবিত্ব কুয়াসা নয়, কল্পনা সত্যের বিরোধী নয়। একালের বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি যদি শুষ্ক হয়েন, অকবি হয়েন,—সে তাঁহার নিজের দোষে, বিজ্ঞানের উপদেশে উপরোধে নাস্তিক হয়েন ও আবশ্যকতায় নহে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বসংসার বিশ্লেষ করেন।

বিশ্ববিশ্লেষ করিয়া কবি হইবারই ত কথা,—অন্তত কবিত্ব ও কবিতা অনুভব করিবারও ত কথা! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ধ্যান ধারণা করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যিনি কবিতা অনুভব না করেন অনন্তের অত্যুজ্জ্বল আভাস না পান তিনি সাংঘাতিক সঙ্কীর্ণমনা। তিনি সশরীরে সঙ্কীর্ণতার অবতার। বিজ্ঞান তাঁহার আলোচ্য হয় হউক; কিন্তু বিজ্ঞানে তাঁহার বোধ শক্তি বিকশিত হয় নাই।

***

কাব্য ও কবিত্ব কেবল কতকগুলা উদ্ভট আষাঢ়ে অনুমানের সমষ্টি সুতরাং বিজ্ঞান আলোকে তাহা বিচ্ছিন্ন ও বিলয় হইয়া যায়, এ সংস্কার ইয়ুরোপেই অগ্রে উত্থিত হয়। কিন্তু ইয়ুরোপে আজও কি এ সংস্কার আছে? যদি থাকে তবে ইয়ুরোপের অবস্থা শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? বৈজ্ঞানিকদিগের-বিষয় বোধ যথার্থই কি এত অল্প, অজ্ঞতা কি এতই অধিক, অনুভব শক্তি কি এতই নিস্তেজ!!! না; যতটা শুনা যায় তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক কবিতা অনুভবে বঞ্চিত নহেন, অনন্ত উপভোগে অক্ষম নহেন।

***

আর্য্য আচার্য্যদিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা বিজ্ঞানে কবিত্বে ধর্ম্মে দর্শনে একাকার দেখাইয়া গিয়াছেন। এ সমস্তের তাদৃশ সামঞ্জস্য, স্বাতন্ত্রের মধ্যে তাদৃশ একত্বভাব, তাদৃশ শৃঙ্খলা ও সম-প্রয়োজনীয়তা বোধ করি (ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য ব্যতীত) আর কোথায়ও নাই। বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত কবিতার কমনীয় ক্রিড়া, ও ধর্ম্মের অনুপম অনুভূতি ও অভিব্যক্তি,—সমভাবে, সমানরূপে অবস্থিত। ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক তুফানের সহিত উপমা ও অলঙ্কারের লীলালহরী একাধারে সমানে ছুটিয়াছে একটী অপরটীকে বাধা দেয় না, এটী ওটীর সহিত বিরোধ করে না, কেহ কাহারো গায়ে ঠেকে না।

***

বিজ্ঞান কি কবিত্ব, ধর্ম্মানুরক্তি কি তর্কতরঙ্গ শঙ্করাচার্য্যে কোনটী পরস্পরের মধ্যে ন্যূনাতিরিক্ত বলুন দেখি? সব কটীই ত সমানরূপে

সতেজ ও সামঞ্জস্যময়। কবিতার উৎসে বসিয়া শঙ্করাচার্য্য বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ করেন। তর্কের প্রবল তুফান তুলিয়া তার পর, তাহার উপর দিয়া, জানি না কি মন্ত্রবলে,—মীমাংসার লাল ডিঙ্গি খানি, শান্তির শুভ্র নিশান উড়াইয়া বাহিয়া যান। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের অত্যন্ত প্রান্ত-সীমাতেও উপাসনার উচ্ছ্বাস উঠান।

***

তন্ত্র-শাস্ত্রের 'ষট্-চক্রের' কথা—আমরা হিন্দুসন্তান সকলেই শুনিয়াছি। 'ষট্-চক্র' কি যোগীই বুঝেন, ভোগী বুঝে না; সংসারী 'ষট্-চক্র' সাধন করিতে পারে না। তা হউক। কিন্তু সাহিত্য-চক্ষে 'ষট্-চক্র' পাঠ করিয়া তাহাতে কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়, এক অপূর্ব্ব কবিতা ও সেই কবিতার মধ্যে এক মনোহর বিজ্ঞান। 'ষট্-চক্রে' শারীরিকি কথা, শরীর তত্ত্বের সমালোচনা, আজ কালকার দিনে সে কথা ত অত্যন্ত শুষ্ক, অতএব তাহার মধ্যে অত আধ্যাত্মিকতা, অমনতর কবিতা কোথা হইতে আসিল! শুষ্ক বিজ্ঞানে সরস কবিত্ব কিরূপে মিশিল!! সে কবিত্ব ও সে বিজ্ঞান এবং সে কবিতা ও বিজ্ঞানের মনমোহন মিশামিশি এ মুহূর্ত্তে অনুশীলন ও অনুভব করা কঠিন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অমূল্য দ্রব্য অনেক সময়ে মূল্যহীন দ্রব্যের মধ্যেই পরিগণিত হয়। 'ষট্-চক্রের' সাহিত্য আমাদের মধ্যে কেহ সমালোচনা করিতে পারেন না কি?

***

ইয়ুরোপে জড়-বিজ্ঞানে ও তত্ত্ব-বিদ্যায়, ধর্ম্মে এবং গৃহকর্ম্মে স্বাভাবিক সদ্ভাব তেমন নাই, কাযেই বলিতে হয়। এ অসদ্ভাবের কারণ বোধ করি, আর কিছুই নয়,—ইয়ুরোপ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভিত্তি প্রথম কল্পে খুব পাকা করিয়া গাঁথিতে পারেন নাই,—ইহাই অসদ্ভাবের কারণ। ইয়ুরোপে ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভাব অপরিপক্ক বা অসম্পূর্ণ এ কথা আমরা বলিতেছি

না,—আমরা বলিতেছি এই যে,—তথাকার ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বনিয়াদ তাদৃশ সুদৃঢ় নয়; সুদৃঢ় নয়, এই জন্য যে, তাহা সাবধানে গঠিত নয়। যে গৃহের বনিয়াদ অমজবুত তাহার উপর সুসময়ে শিল্প বিজ্ঞানের যতই চাক্‌চিক্য ও চিক্‌নাই করুন না, আঘাত আক্রমণ অনায়াসে সহ্য করিতে সে গৃহ সমর্থ নয়; পরন্তু বনিয়াদ পোক্তা না হইলেই আঘাত আক্রমণও তাহার উপর বেশি বেশি হয়। ইয়ুরোপীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমূহের কতককাল হইতে ঠিক এই অবস্থা হইয়াছে।

⁂

ভিত্তি মজবুত নয়, কাযেই সর্ব্বদা মেরামত করিতে হইতেছে; মেরামতে মানাইতেছেও না। ধর্ম্ম-শাস্ত্র সুগঠিত ও সুদৃঢ় নয় বলিয়াই ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ইয়ুরোপীয় ধর্ম্মের সহিত দ্বন্দ্ব করে এবং দ্বন্দ্ব করিতে সমর্থ হয়। আসল কথা ইউরোপে আজও এমন একটী অভেদ্য অটল ও চিরস্থায়ী প্রণালী, সত্য ও নিত্য নিয়ম আবিষ্কৃত বা উদিত হয় নাই, যাহার উপর মনুষ্য-জীবন সম্পূর্ণরূপে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, যাহার উপর ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যা, জ্ঞান এবং ভক্তি প্রেম নির্ব্বিবাদে অবস্থিতি করিতে পারে। তবুও কিন্তু ইয়ুরোপের আশা আছে। আমাদের অপেক্ষা অধিকতর আশা আছে। যাহা সংসাধিত হয় নাই, ভবিষ্যতে তাহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে।

⁂

জড়বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য জাতি ক্ষিপ্রহস্ত দেখাইয়াছেন, ইহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। সুখ ও শান্তি সাধারণ্যে বিস্তৃত হওয়া না হওয়া স্বতন্ত্র কথা; শিল্প ও সাংসারিক বিষয় ব্যাপারে ইয়ুরোপীয়েরা বহুল বিস্তৃত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অকৃত্রিম অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত যত্নই অবশ্য এ উন্নতির মূল এবং এ উন্নতিও উপেক্ষণীয় নয়।

* * *

এক দিকে এই অবস্থা। অপরিসীম বিষয়তৃষ্ণা ও অবিরত বিষয় ব্যাপৃতি ও বাহ্য বিজ্ঞানের বিসদৃশ অনুশীলন এক দিকে। অপর দিকে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ও বৈরাগ্যের বনিয়াদ কাঁচা বড়ই অল্প। কাযেই কোন কোন স্থলে এ অবস্থার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, কতক লোকে বুঝিয়া বসিয়াছেন যে, "ধর্ম্মটা বোকাকে ধোকা দিবার জন্য চতুর লোকে বানাইয়াছিল। চতুরের চাতুরী গোপন করিবার জন্যই ধর্ম্মের আবরণ, বৈরাগ্যের বকাবকি ও কবিতার কুয়াসাময় কুহক।" ইয়ুরোপে সাধারণত ইতর লোকের এতদ্রূপ অবস্থা। তাহারা অনেক স্থলেই ধর্ম্মহীন ও কবিতা অনুভবাক্ষম, কোমলতাহীন এবং হৃদয়হীনও বটে। এখন আমরা যদি ইয়ুরোপের ইতরদিগের অনুকরণ করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদিগকে ধর্ম্মহীনতা, কবিতা ও কোমলতাহীনতা শিক্ষা করিতে হয়। আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে অসাবধানে ও অসংযত মনে ইয়ুরোপীয় বিষয় অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিজ্ঞান ভ্রমে বিষ কণ্ঠস্থ না করেন, এই জন্যই আমাদের ইয়ুরোপীয় এত কথা।

* * *

ক্রমাগত কল কবজার করকরাণি ও অস্ত্র যন্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে বোধ করি, ইয়ুরোপে অনেকে, বিশেষতঃ ইতর লোকেরা ধর্ম্মচিন্তার সময় পান না, কবিতা ও কোমলতা অনুশীলনের ফুর্‌সদ পান না। ইয়ুরোপের শীতের ন্যায় ইয়ুরোপীয় মানব-প্রকৃতিও কিছু কঠোর। পবিত্রতা ও কোমলতা উত্তেজনার জন্য তথায় বিস্তর সাজ সরঞ্জম উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়। দৃষ্টান্ত সম্মুখেই দেখুন। সাহেব বাহাদুরের গৃহদ্বার, পুষ্প-বাটিকা, কেমন সুন্দর ও মনোহর ও কবিতা উত্তেজক! বাহ্য প্রকৃতির কোমলতা ও সুকুমার মাধুরী তাঁহার অষ্টপৃষ্টে বস্তুতই বিছান রহিয়াছে;—তবুও সাহেব বাহাদুরের নিজের মানব প্রকৃতি চব্বিশ ঘণ্টা গরম, অন্তরাত্মা কোপ-কুঞ্চিত। কবিতা কোমলতা ত বহুদূরের কথা; কঠোরতা ও শুষ্কতায় ইট, পাটকেলও পরাভূত হয়। অনেক সময়ে মেম সাহেবেরই "ত্রাহি মধুসূদন"। স্বভাবের সুকোমল শয্যায় শায়িত থাকিয়াও, প্রকৃতির পূর্ণ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াও এক

মানব প্রকৃতির এই দুরাবস্থা। কিন্তু পক্ষান্তরে,—পর্ণকুটীরে বসিয়া, স্বভাবের ও শিল্পের শোভা মাত্রে রঞ্জিত হইয়া আর এক মানব প্রকৃতি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে, কবিতায় ও কোমলতায় মুগ্ধ হয়। এই দুইটী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রকৃতির অত্যন্ত সাধারণ আদর্শ মাত্র।

***

তাহা হউক। পাশ্চাত্য পরাক্রম প্রকৃতিকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজয় করিতেছে। উহা বাঁকাকে সোজা করিতেছে, আর আমরা সোজাকে সোজা রাখিতে পারিতেছি না। ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান কঠোরতা অনুমোদন করে, নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং বৈজ্ঞানিক মাত্রেই শুষ্ক হৃদয়, অকবি—এবং ধর্ম্ম কর্ম্মহীন এরূপ মনে করা অন্যায়।

***

অবিমিশ্র জড় বিজ্ঞানের প্রধান আচার্য্য উপাসক এবং হোতা ডার্বিণ। ডার্বিণ কাব্য-রসে বঞ্চিত ছিলেন না,—ধর্ম্ম-চক্ষু বিহীনও ছিলেন না। ডার্বিণ আদরে ও যত্নে এবং বহু প্রহর ব্যয় করিয়া কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিতেন। সেক্ষপিয়ার, মিলটন, বায়রণ ও স্কটের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি হোরেসের গীতি ভাল বাসিতেন।

***

'বিগ্ল' নামা জাহাজে ডার্বিণ এক সময়ে সমুদ্র যাত্রা করেন। জাহাজের যাত্রিদিগের একটীর অতিরিক্ত পুস্তক সঙ্গে লইয়া যাইবার আদেশ ছিল না। ডার্বিণ এই একমাত্র পুস্তক মনোনীত করিয়াছিলেন—মিলটনের কবিতা-গ্রন্থ।

***

'প্যালির' ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকাবলি পাঠ করিয়া ডার্বিণ পরম প্রীত হইতেন। সে গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতও অগ্রাহ্য নয়। The logic of this book (the "Evidence") and, as I may add, for his "Natural Theology" gave me as much delight as did Euclid" বলা বাহুল্য; ডার্বিণ যুক্লিদের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

***

ডার্বিণ সম্বন্ধে উপরিউক্ত কথাগুলি অবশ্য তাঁহার যুবাকালের কথা, কিন্তু কথাগুলি যে সে লোকের নহে। জড়বিদ্যার অন্যতম উপাসক ও উপদেষ্টা হক্স্লির। জড় বৈজ্ঞানিকেরা নিজে জড় নহেন, এটী তাঁদের শত্রু মিত্র দুই পক্ষের জানা উচিত।

———:o:———

পুরাতন প্রতিনিধির স্বদেশ প্রত্যাগমন ও নবীন প্রতিনিধির শুভাগমন দুই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যস্থলে 'মালঞ্চের' জন্ম। অতএব উল্লিখিত উভয় মহাজনকে নতশিরে আমাদিগের নমস্কার। রাজনীতির আলোচনা যদিও আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য নহে, তথাচ রাজনীতির সহিত আমাদিগের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। কারণ সন্নীতিতে শান্তি ও স্বচ্ছলতা। স্বচ্ছলতা ও শান্তিতেই সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি।

***

আমরা আশা করি,—পরমেশ্বরের নিকট কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করি,—লর্ড লান্সডাউনের সুশাসনে ভারতসাম্রাজ্য শান্তি স্বচ্ছলতায় পূর্ণ হয়। ভারত ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি-পরম্পরা অনেকেই আমাদিগকে বাক্যের আশ্বাস বিস্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে,—ভারতবাসীর ভাগ্যদোষেই বলিতে হইবে,—সে আশ্বাস সদনুষ্ঠানে পরিণত করিতে তাঁহাদের সাহসে সঙ্কুলান হয় নাই। শুনিতেছি, আমাদিগের এই নবীন শাসয়িতার

ইষ্টমন্ত্র (Motto) "By courage, not words"। অর্থ ;—"সাহসে করিবে কার্য্য, বাক্য কিছু নয়" । এই 'মটো' এখন আমাদিগেরও মূলমন্ত্র হইল ; অষ্টপ্রহর জপ করিব এবং দেখিব ভারতভাগ্যে এই মন্ত্রের সাধন কি পরিমাণে হয়। বাক্য বস্তুতই আমরা বিস্তর শুনিয়াছি এবং বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, বাক্য যথার্থই কিছু নয়। লর্ড লান্সডাউন সাহসে সৎকার্য্য সাধন করুন। সর্ব্বত্রে সুযশ হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজি গ্রন্থাবলী। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।" বিলাতি সপ্তাহিক সাহিত্যপত্র "এথিনিয়ামে" উক্ত গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দেখিলাম। সমালোচক, বক্ষমান গ্রন্থকর্ত্তা ও তাঁহার সম্পাদককে উপলক্ষ করিয়া ও সমালোচ্য গ্রন্থ ও তৎসন্নিবিষ্ট সম্পাদকের 'ভূমিকা' হইতে দুই একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "গ্রন্থেতিহাস-বিজ্ঞানে" ভারতবাসীর প্রতিভা প্রচুর নয়। "The genius of natives of India is, not bibliographical. ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সত্বেও এবম্বিধ মন্তব্য কি পরিমাণে প্রকৃত বলিতে পারি না। কিন্তু সমালোচকের সমালোচনা সাহিত্য ছাড়িয়া সমাজে, সমাজ ছাড়িয়া বাঙ্গালীর রাজনৈতিক সত্বাধিকার পর্য্যন্ত ক্রমে উর্দ্ধগামিনী হইয়া উঠিয়াছে। কৌতুক কিছু গাঢ়। সমালোচকটী কে?

* * *

শিক্ষিত ভারতবাসী বিশেষতঃ 'বিষদর্শন' বঙ্গবাসী তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য 'সমাজ সংস্কার' ছাড়িয়া রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য ব্যস্ত কেন,—এই বাঁধি বুলিটা আজ কাল,—বোধ করি, কঙ্গ্রেসেরই কল্যাণে, বড়ই বেশী বেশী শুনা যাইতেছে। বিদায় প্রাপ্ত বড় লাট বলিয়া গেলেন তাই, "Letters on India" লেখক জনৈক 'প্রফেসর' প্রস্তাব করেন, তাই, আমাদের উল্লিখিত সমালোচক সমঝাইতে চান নাই। যে সে লোকের মুখে শুনিতেছি, এই সমাজ সংস্কারের কথা। হিন্দুসমাজ সংস্কার

ব্যতীত সৌরজগত যে সে যথার্থই উল্টাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের সংস্কারের ছড়া হাঁড়ি ধরিয়া পথের লোকেই এক এক পাক দিয়া যাইতেছে। তা সংস্কারকের অভাবটা ইহাঁরা দেখিলেন কোথায়, বুঝিতে পারি না। আমরা ত দেখিতেছি, সমাজসংস্কারক পালে পালে ডালে ডালে। আরও চাই!!

* * *

'এথিনিয়ামের' লেখক সমাজ-সংস্কারের ধূয়ায় গাইয়াছেন যে, রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সতী-দাহ ও শিশু-হত্যা নিবারণ সমাজের সুদূরস্পর্শী সংস্কারে সমর্থ হয় নাই। এমন কি, সেটা সামান্য জনকতক বাঙ্গালী ও অন্যান্য সেই সকল লোকের মধ্যেও হয় নাই, যাহা এখন "রাজনৈতিক মুক্তির জন্য" বৃথা বকাবকি করিয়া গোর গোল করিতেছে। সংস্কারটা হয় নাই, Even among the small minority of Bengalis and others who are now becoming clamorous for political enfranchisement. এ কসুর অবশ্য কঙ্গ্রেসেরই।

* * *

"এথিনিয়াম" সাহিত্যের শান্তক্ষেত্রে বিচরণ করেন। রাজ-নৈতিক কথা তাঁহার ব্রত-বিরুদ্ধ। কিন্তু বাঙ্গালীকে পাইয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এক গৎ গাইয়া দিলেন। "হায় হায়! বাঙ্গালী যায় কোথায়!"

সে কালে "জন কোম্পানীর" আমলেও "গবর্মেণ্ট গেজেট" ছিল। তবে তখনকার সে গেজেটে আর এখনকার গেজেটে তফাৎ ঢের। এখনকার গেজেট নেহাত্ নীরস,—"শুষ্ক-কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে।" তখনকার গেজেট রসাল, রঙ্গিল, মজেদার। কোম্পানী বাহাদুরের ব্যবসা বাণিজ্যের বিবিধ বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া, গল্প-গুজব গান-গজল অবধি তখনকার গবর্মেণ্ট গেজেটে থাকিত। সে এক অদ্ভুত পদার্থ!

* * *

সে আর আজ কতদিনেরই বা কথা। ৫০।৬০ বৎসরের বেশী নয়। ১৮২৫ সালের 'গবর্মেণ্টি গেজেটের' "কবি-কোন" (Poet's Corners) হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়া পাঠককে পৌষ পার্ব্বণী দেওয়া যাইতেছে।

ODE TO A PUNKHA.

Whilst the luxurious soldier or civilian,
Quaffs blushing lal beneath thy swing,
And gulps fictitious airs, which drive a million,
Mosquitoes from him buzzing on the wing,
Refreshing flapper! Influence devine!
Prime relisher of feasts, unmeasured praise be thine,

* * *

Oh—I love to write about thee
For I cannot breathe without thee?

***

পাখার স্তোত্র।

সৈনিক,—সিবিল শুয়ে তোমার তলায়,
আরামে আমীর তারা সুখেতে ঘুমায়
শিমের সমীর খায়, তোমার হিল্লোলে,
উড়িয়ে পলায় মশা পালে পালে পালে।
প্রাণ জুড়ানী আড়ানী! দৈব গো তোমার,
মজেদার করো খানা, শত নমস্কার শ্রীপদে তোমার।
বড় ভালবাসি আমি বর্ণিতে তোমায়
নিশ্বাস ছাড়িয়ে বাঁচি তোমার কৃপায়।

***

পাঠক! পরন্ত—পাঠিকা! শীতের শৈত্যে সিহরিবেন না। পৌষেও 'পাখার' প্রয়োজন হয়। প্র——র পিত্তজ ধাতু, তায় কঙ্গ্রেস—অণ্ড-কটাহের আগ্নেয় উত্তাপ।

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্য-মঙ্গল।
শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।
সাহিত্যক্ষেত্রের একটি নূতন উপাদেয় ফল।
যেমন সুস্বাদু—তেমনি পুষ্টিকারক।
মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

সাত-নরী।
নূতন প্যাটনে প্রবীণ কারিকর কর্ত্তৃক প্রণীত।
বালি সিকি মুদ্রা মাত্র।
নিম্ন স্থানে মূল্য পাঠাইলেই মিলিবে।
শ্রীঅঘোরনাথ কুমার।
৩৪নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেন, তালতলা কলিকাতা।